ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১
Fish Culture and Breeding-1

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৭৫১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মো: শরীফ উদ্দিন

হাসনাৎ জাহান

ড. মো: আনিচুর রহমান মৃধা

কৃষিবিদ বিপ্লব বিকাশ পাল চৌধুরী

কৃষিবিদ মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন

কৃষিবিদ মো: আবুল কালাম আজাদ

কৃষিবিদ মো: মোস্তফা কামাল (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও চাষযোগ্য দেশি এবং বিদেশি মাছের পরিচিতি

Fisheries Resources of Bangladesh and Introduction to Culturable Indigenous and Exotic Fishes





বৈচিত্র্যময় মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ আমাদের বাংলাদেশ। আবহমান কাল থেকে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ বলেই আমরা "মাছে ভাতে বাঙ্গালী"। নদী-খাল, হাওড়-বাঁওড়, পুকুর-ডোবা ছাড়াও আমদের রয়েছে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল আর বিশাল বঙ্গোপসাগর। আমাদের দেশে একদিকে রয়েছে মিঠা পানির মাছ যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, শিং, মাগুরের সমারোহ অপর দিকে রয়েছে অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ লোনা পানির মাছ যেমনঃ ইলিশ, রুপচাঁদা, কোরাল, লইট্যা, লাক্ষ্যাসহ বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক মাছ। সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মিঠাপানির মাছের মধ্যে চাষযোগ্য প্রজাতিসমূহের পরিচিতিসহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংগসংস্থানিক বিষয়ে জানা প্রয়োজন।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও তার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হ্রাসের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে জানতে পারব
- মাছের শ্রেনিবিন্যাস করতে পারব
- চাষযোগ্য দেশি ও বিদেশি মাছ শনাক্ত করতে পারব
- চাষযোগ্য দেশি ও বিদেশি মাছের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংগসমূহ শনাক্ত করতে পারব

১.১ মৎস্য ও মাৎস্যসম্পদ

মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য অথবা অগ্রহণযোগ্য পানিতে বসবাসকারি সকল প্রকার প্রাণিকূলকে সাধারণভাবে মৎস্য বলে অভিহিত করা হয়। যেমন- মাছ, সাপ, ব্যাঙ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কুঁচে ইত্যাদি। পানিতে বসবাসকারী যে সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে তা মাৎস্যসম্পদ হিসেবে পরিচিত।

১.২ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য খাতের অবদান

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মৎস্য সম্পদ থেকে এ দেশের প্রায় ১২ লক্ষ লোকের সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থান হয়। এর পাশাপাশি প্রায় ১.২ কোটি লোক মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে খণ্ডকালীন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের অধিক লোক জীবিকা অর্জনের জন্য মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। মৎস্য সম্পদ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

ক) নদী ও খাড়ি অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ:

দেশের অসংখ্য নদ-নদী ও খাড়ি অঞ্চলে প্রায় ৪ লক্ষ মৎস্যজীবী ইলিশ ও অন্যান্য মাছ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১০-১৫ ভাগ আসে ইলিশ থেকে।

খ) সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় মৎস্য সম্পদ:

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলই সুন্দরবন। এ বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আধা-লবণাক্ত পানির নদী, খাড়ি ও খাল, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের নার্সারি, বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব এলাকায় সারা বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক জেলে মৎস্য সম্পদ আহরণের সাথে জড়িত।

গ) হাওর ও প্লাবনভূমি অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ:

দেশের হাওর ও প্লাবনভূমি এলাকায় প্রায় ৫০-৬০ হাজার মৎস্যজীবী বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বিভিন্নভাবে মাছ আহরণের সাথে জড়িত থাকে। উল্লেখ্য: দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে হাওর ও প্লাবনভূমি।

ঘ) উপকূলীয় চিংড়ি চাষ :

দেশের উপকূলীয় এলাকায় ছোট বড় প্রায় ২০-২৫ হাজার চিংড়ি ঘের রয়েছে যা চিংড়ি চাষ এলাকা নামে পরিচিত। এসব ঘেরে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ কর্মী সারা বছরের জন্য নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

ঙ) মৎস্যচাষ ও মৎস্য প্রজনন:

দেশে প্রায় ১৯ লক্ষ পুকুর-দিঘি রয়েছে। এসব পুকুর-দিঘিতে লক্ষ-লক্ষ লোক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির মাছচাষ করছে। এতে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে এবং বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবার জীবিকা

নির্বাহ করছে। এ ছাড়াও দেশে প্রায় দুই হাজারের বেশি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে এবং এসব প্রজনন কেন্দ্রে সারা বছর প্রায় লক্ষাধিক কর্মী নিয়োজিত থাকে।

চ) সমুদ্র উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ:
আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রায় সবটাই উপকূলীয় অগভীর সাগরে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ও অপেক্ষাকৃত গভীর সাগরে বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। এ কাজে আনুমানিক ৪ লক্ষ জেলে সারা বছর মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মে সরকারি ও বেসরকারি আরও ১০-১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। ভবিষ্যতে মৎস্যচাষ বাড়ার সাথে সাথে এ সেক্টরে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

১.৩ বাংলাদেশের জলজ সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস

আমাদের দেশ বিপুল জলজসম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দিঘি, ডোবা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও নদ-নদী। সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকৃতি অনুসারে দেশে বিদ্যমান জলজ সম্পদকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদ:
আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। চীন এবং ভারতের পরেই আমাদের অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদের অবস্থান। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদকে আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়:
আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় বিভিন্ন প্রকার মৎস্য প্রজাতিতে সমৃদ্ধ। আমাদের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির দেশি মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি। অতীতে এসব উৎস হতে দেশের মোট আহরিত মাছের বহুলাংশ পাওয়া যেত। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়কে আবার নদী ও খাড়ি অঞ্চল, হাওর ও বিল, প্লাবনভূমি এবং কাপ্তাই হ্রদ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) নদী ও খাড়ি অঞ্চল: অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো নদ-নদী, মোহনা ও খাড়ি অঞ্চল। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনাসহ অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। সংখ্যার দিক থেকে দেশের মোট ২৩০টি নদ-নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার। এসব নদ-নদীর মোহনা, খাড়ি অঞ্চল ও সুন্দরবন এলাকাসহ মোট আয়তন প্রায় ২৬.৩১ লক্ষ হেক্টর।



চিত্র-১.১ নদী

(২) হাওর ও বিল: হাওর হচ্ছে নিচু জলাভূমি, যেখানে বর্ষাকালে ৬ থেকে ৭ মাস পানি থাকে। প্রতিটি হাওড়েই বেশ কিছু বিল এবং খাল থাকে। বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকায় সর্বাধিক হাওর এবং বিলের অবস্থান। এসব হাওর এবং বিল মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ। শুষ্ক মৌসুমে বিল ও হাওর এলাকায় প্লাবনভূমির মাছ এসে জমা হয়। ফলে এসব জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়।



চিত্র-১.২ হাওড় ও বিল

(৩) প্লাবনভূমি: বাংলাদেশের কোনো কোনো বিস্তৃত এলাকা বছরে ৪ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত কমবেশি প্লাবিত থাকে। এ সকল প্লাবিত এলাকা প্লাবনভূমি নামে পরিচিত। দেশে প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। এসব প্লাবনভূমি মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লাবনভূমিতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণ রুই জাতীয় মাছের পোনার পাশাপাশি কই, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ প্রাকৃতিক উপায়েই জন্মায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অধিক ফসলের আশায় ধানক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় ও অন্যান্য মাছের ডিম ও পোনার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ এবং নাটোর জেলার বেশ কিছু এলাকায় বর্ষাপ্লাবিত নিচু ধানী জমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।



চিত্র-১.৩ প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ

(৪) কাপ্তাই হ্রদ: কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্ববৃহৎ একমাত্র কৃত্রিম জলাশয়, যা মাছচাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে সৃষ্ট কাপ্তাই হ্রদ একটি বৃহত্তম কৃত্রিম জলাধার, যার আয়তন প্রায় ৬৮,৩০০ হেক্টর। কর্ণফুলী নদীর উপর ১৯৬১ সালে কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দেওয়ার ফলে এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান। পাহাড়ী উপত্যকা নিমজ্জিত হয়ে এ হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে এ হ্রদের তলদেশ বেশ অসমান। এ হ্রদের সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৫ মিটার এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৯ মিটার। বেড়জাল, ফাঁসজাল এবং বড়শি দিয়ে কাপ্তাই হ্রদ থেকে মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে।



চিত্র-১.৪ কাপ্তাই হ্রদ

অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়:

মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে এসব বদ্ধ জলাশয় ব্যবহৃত হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদনের দিক থেকে এসব জলাশয় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল। তবে এখন পর্যন্ত সব বদ্ধ জলাশয় আধুনিক উপায়ে মাছচাষের আওতায় আসে নাই। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়কে নিম্নবর্ণিতভাবে ভাগ করা যায় :-

২০১৬

(১) পুকুর-দিঘি: দেশে প্রায় ১৯ লক্ষ পুকুর-দিঘি রয়েছে, যার আয়তন ৩.০ লক্ষ হেক্টরের কিছু বেশি। দেশের পুকুর-দিঘির অধিকাংশ গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য খনন করা হয়। এছাড়াও গ্রামীণ লোকজনের বসবাসের প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কাটার ফলে অনেক পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এসব পুকুর বা জলাশয়ে পরিকল্পিত উপায়ে মাছচাষ হচ্ছে। আবার পুকুরে মাছচাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় সম্প্রতি নতুন নতুন অনেক পুকুর খনন করা হচ্ছে।



চিত্র-১.৫ পুকুর

(২) বাঁওড়: প্রবাহমান নদী অনেক সময় নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে মূল গতিপথ পরিবর্তন করে বন্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এসব রূপান্তরিত বন্ধ জলাশয়কে বাঁওড় বলে। বাঁওড় সৃষ্টির একটি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ব-দ্বীপ অববাহিকার নদীসমূহ সময়ের কাল প্রবাহে পলিতে ভরাট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে কোনো প্লাবনে ক্ষীণ ধারার নদীগুলো তার মূল গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বা প্লাবনে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলেও পূর্ববর্তী গতি ধারার গভীরতম অংশের বাঁকগুলো বন্ধ জলাশয় হিসেবে থেকে যায়। পরবর্তীতে এ জলাশয়গুলো বাঁওড় নামে পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর এবং কুষ্টিয়া জেলায় ছোট বড় প্রায় ৬০০টি বাঁওড় আছে।



চিত্র-১.৬ বাঁওড়

২০২৫

(৩) উপকূলীয় চিংড়ি খামার: দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় জেলাগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকায় আধা-লবণাক্ত পানি জোয়ার-ভাটায় উঠানামা করে। দক্ষিণাঞ্চলের এসব জমিতে জোয়ারের পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষ করা হয়। উপকূলীয় এলাকার চিংড়ি খামারে এভাবে লবণাক্ত পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষকে ঘেরে চিংড়ি চাষ বলে। জোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি যাতে ধানক্ষেতে প্রবেশ করে ধান চাষের ক্ষতি করতে না পারে এজন্য উপকূলীয় নদীর পাড় ঘেষে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মাণ করেছে। বাঁধে স্থাপিত স্লুইচগেটের সাহায্যে চিংড়ি চাষের জমিতে জোয়ারের সময় লোনা পানি ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়।



চিত্র-১.৭ চিংড়ি ঘের

খ) সামুদ্রিক জলজ সম্পদ:

আমাদের সামুদ্রিক জলজ সম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর ৭১০ কিলোমিটার সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপকূল হতে মহীসোপানের দিকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকাকে একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা EEZ - (Exclusive Economic Zone) বলা হয়। বিশাল এ সমুদ্র এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ২৫ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ১২ প্রজাতির শিরোপদী বা সেফালোপোডা, ৩০১ প্রজাতির শামুক-ঝিনুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির তিমি, ডলফিন, তারামাছ, স্পঞ্জ, কচ্ছপ, শৈবাল, প্রবাল ইত্যাদি বিদ্যমান। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের মোট মৎস্য সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। দেশের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১৬ শতাংশ আসে সামুদ্রিক আহরণ থেকে।

১.৪ জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে মৎস্যখাত

জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের খাদ্য তালিকায় ভাতের পরেই মাছের স্থান। মাছ মানুষের প্রধান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটায়। আমিষ ছাড়াও মাছে অন্যান্য খাদ্য উপাদান রয়েছে। শিশুদের এবং সন্তানসম্ভবা মহিলাদের জন্য মাছ একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। নিচে মাছের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

২০২৫

ক) আমিষের উৎস হিসেবে মাছ:

আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ বা মৎস্য সম্পদ। প্রয়োজনীয় আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ এ সম্পদ থেকে পেয়ে থাকি। এছাড়াও মাছের দেহে রয়েছে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ১০টি অ্যামাইনো এসিড। উদ্ভিজ আমিষে শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় সকল অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান থাকে না বা থাকলেও কিছু কিছু উপাদান খুবই কম পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। মাছের প্রাণিজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষের চেয়ে সহজে হজমযোগ্য। মাছের আমিষ ৮৫-৯৫ শতাংশ হজমযোগ্য। তাই সুস্থ-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমিষের উৎস হিসেবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণে মাছ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) লিপিডের উৎস হিসেবে মাছ:

লিপিডের উৎস হিসেবে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাছ ছাড়াও গরু বা খাসির মাংস থেকে আমরা লিপিড বা চর্বি পেয়ে থাকি। গরু বা খাসির মাংস উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত হওয়ায় হৃদরোগ বা স্ট্রোক-এর ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ গ্রহণ করলে শরীরে কোলেস্টেরল তো জমেই না, বরং শরীরে জমাকৃত খারাপ কোলেস্টেরল হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও মাছের দেহে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড নামক এক ধরণের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যা রক্তে কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা হ্রাস করার মাধ্যমে হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা হ্রাস করে।

গ) ভিটামিনের উৎস হিসেবে মাছ:

বাংলাদেশে দৈনিক ১০০ জন শিশু কেবল ভিটামিন 'এ' এর অভাব জনিত কারণে অন্ধ হয়ে যায়। খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ মাছ গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করে আমরা এ সমস্যা থেকে সহজেই পরিত্রাণ পেতে পারি। মাছের যকৃৎ ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'ডি'-তে সমৃদ্ধ: যা হাড়, দাঁত, চর্ম ও চোখের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। মাছে প্রচুর ভিটামিন 'বি', বিশেষ করে ভিটামিন 'বি' ও নিয়াসিন রয়েছে। সুতরাং পরিবারে ভিটামিনের অভাব পূরণে মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) খনিজ লবণের উৎস হিসেবে মাছ:

মাছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ যেমন- লৌহ, তামা, দস্তা, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। মাছের কাঁটা ক্যালসিয়াম ও ফসফরসের একটি ভালো উৎস। ছোট মাছের কাঁটায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। কাঁটাসহ খাওয়া যায় বিধায় পরিবারের সদস্যদের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের চাহিদা পূরণে ছোট মাছ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১.৫ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে। আগে নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছের বিচরণ ছিল। বিভিন্ন মৌসুমে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত এলাকায় মাছের

২০২৫

উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু প্রজাতি বিপদাপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ সমূহকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) প্রাকৃতিক কারণ

যেসব প্রাকৃতিক কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, নদী ভরাট, পলি জমা, মাছের রোগ বালাই, অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচন ইত্যাদি অন্যতম। নিচে এসব কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

(১) পলি ভরাট: বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙ্গন, ভূমি ক্ষয় হয়ে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পলি পানি বাহিত হয়ে উজান থেকে ভাটিতে নদ-নদী, খাল-বিলে জমা হয়। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে দেশের বাইরে থেকে হাজার হাজার টন পলি, বালি, নুড়ি প্রভৃতি স্রোতের টানে ভেসে আসে এবং সাগরে নিপতিত হওয়ার পূর্বেই নদ-নদীর তলদেশে জমা হচ্ছে। এভাবে পলি জমার ফলে নদ-নদীতে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং নদীর মুখ বা খাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র কমে আসছে। এ ছাড়াও নদী বা খালে মাছের পরিভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে আগে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননের জন্য যে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল কালক্রমে তা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এতে মাছের বংশবিস্তার ব্যাহত হয়ে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।



চিত্র-১.৮ পলি ভরাট

(২) নদী ভরাট: প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রতি বছরই বসতবাড়ি ও আবাদি ভূমি একদিকে যেমন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, অন্যদিক তেমনি মানুষ সৃষ্ট কারন তথা নদী দখল করে নদী ভরাটের ফলে মৎস্যকূলও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা নদী ভরাটের ফলে মৎস্য উৎপাদনের সহায়ক পানির গভীরতা, স্রোত, বিচরণ এলাকা কমে এবং মৎস্যকূলের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে মাছের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।



চিত্র-১.৯ নদী ভরাট

(৩) মাছের রোগ বালাইঃ রোগ-বালাইয়ের কারণেও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ-বালাইয়ের কারণে মাছের ব্যাপক মড়কের ফলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। যেমন- ক্ষত রোগের কারণে বিগত কয়েক বছর পূর্বে দেশে কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।



চিত্র-১.১০ মাছের রোগ বালাই

(৪) অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচনঃ অনেক সময় অতিরিক্ত জলজ আগাছা মৎস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। আবার এগুলো পচে গিয়ে পানি দূষণের মাধ্যমেও মাছের ক্ষতি করে থাকে।



চিত্র-১.১১ জলজ আগাছা

২০২৫

খ) মানব-সৃষ্ট কারণ সমূহ:

প্রাকৃতিক কারণসমূহ ছাড়াও মানব-সৃষ্ট নানাবিধ কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসে মানব-সৃষ্ট কারণ সমূহ হলো-

(১) অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ: জোয়ার-ভাটা হয় এবং বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারে, এমন সব নদ-নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয় যাতে বন্যা বা জোয়ারের পানি বাঁধের ভিতরের জমির ফসল ও মানুষের ঘর-বাড়ির ক্ষতি করতে না পারে। এভাবে বাঁধ নির্মাণের ফলে আপাত দৃষ্টিতে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে, চাষীর বাড়ি-ঘর বন্যা-প্লাবন হতে রক্ষা পেয়েছে এবং মানুষের কষ্ট কমেছে। তবে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জোয়ারের বা বন্যার পানিতে অধিকাংশ মাছ প্রজনন করে। এছাড়া প্রজননের জন্য ছোট বড় প্রায় সব মাছই এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে।

প্রজননের জন্য মাছ সাধারণত সদ্য প্লাবিত অগভীর অঞ্চলে পরিভ্রমণ বা গমনাগমন করে। যেখানে মাছের ডিম বা রেণু ছোট ছোট ঘাস পাতায় লেগে থাকে এবং খাদ্য খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এভাবে অগভীর অঞ্চলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নদ-নদীর গভীর অংশে বসবাসের জন্য ফিরে আসে। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরির ফলে প্রজনন উপযোগী অগভীর অংশ বিচ্ছিন্ন থেকে যাওয়ায় মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।



চিত্র-১.১২ অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ

(২) নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড: নগরায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে বহু জলাভূমি ভরাট করে বাড়িঘর নির্মিত হচ্ছে। ফলে মাছ উৎপাদনযোগ্য জলাভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইহাও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।



চিত্র-১.১৩ নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

(৩) কৃষি জমিতে কীটনাশক এবং সারের যথেচ্ছ ব্যবহার: কৃষির অংশ হিসেবে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য ষাটের দশক থেকেই জোর সম্প্রসারণ তৎপরতা চালানো হয়। অধিক ফসলের আশায় চাষীরাও যথেচ্ছভাবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কীটনাশক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে চাষীর উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। কিন্তু এসব কীটনাশকের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফসলের উপকারী এবং ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করে এমন সব বন্ধু পোকা-মাকড় ধ্বংস হচ্ছে। কীটনাশকের মিশ্রণ তৈরি করার সময় ব্যবহৃত স্প্রে-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাল-বিল, নদী-নালায় ধোয়ার ফলে অথবা বৃষ্টির পানিতে ক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশকের কিছু অংশ দ্রবীভূত হয়ে খালে-বিলে বা জলাশয়ে পড়ে। ফলে মাছের ডিম, পোনা বা ছোট মাছ সরাসরি মারা যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অনেক সময় কীটনাশকের অবশেষ পানিতে ধুয়ে খালে বিলে যাওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্তিসহ মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে সহসাই মাছ রোগাক্রান্ত হচ্ছে। এসব কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।



চিত্র-১.১৪ কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার

(৪) জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা: উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষের জন্য কৃষককে অতিরিক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ নেই সেখানে কৃষককে পুকুর বা জলাশয় থেকে

ক্ষেতে পানি সেচ দিতে হয়। এভাবে বিল-ঝিল হতে ক্রমাগত সেচের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে এক সময় পানি কমতে কমতে শেষে মাছের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এক সময় চাষী বা এলাকার লোকজন জলাশয়ের অবশিষ্ট পানি সেচে সম্পূর্ণ মাছ ধরে ফেলে। এভাবে ছোট ছোট বিল, খাল, ডোবা প্রভৃতি সেচের মাধ্যমে শুকিয়ে মাছ আহরণের ফলে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।



চিত্র-১.১৫ জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা

(৫) অতি আহরণ: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সর্বদাই প্রাপ্য মাছের তুলনায় চাহিদা অনেক বাড়ছে। ফলে বেশি চাহিদা মেটানোর জন্য মৎস্যজীবীগণ আরও বেশি সময়, যন্ত্রপাতি ও লোকবল নিয়োজিত করে মাছ আহরণে সচেষ্ট হয়। এভাবে নদ-নদী, খাল-বিলে অতি আহরণজনিত কারণে পরের বছর প্রজননের জন্য আর মা মাছ থাকছে না বা কমে যাচ্ছে।



চিত্র-১.১৬ অতি আহরণ

(৬) পানি দূষণ: মৎস্য সম্পদ হ্রাসের মানব-সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে পানি দূষণ অন্যতম। আমাদের দেশের শিল্প নগরীগুলোর অধিকাংশই নদ-নদীর পাড়ে অবস্থিত। এসব শিল্প-কারখানার বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নদ-নদীতে ফেলার ফলে মারাত্মকভাবে পানি দূষিত হচ্ছে। এতে আমাদের জলজ পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে নদ-নদী ক্রমান্বয়ে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ছে।



চিত্র-১.১৭ পানি দূষণ

১.৬ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হ্রাস প্রতিকারের উপায়সমূহ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

(ক) - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে বন্যা বা জোয়ারের পানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না করে আংশিক বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। যাতে কিছু পরিমাণ মাছ প্রজননের জন্য খাল-বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং বিলের সদ্য প্লাবিত এলাকায় প্রজনন ঘটিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে,

(খ) - বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সাথে ফিশপাস বা ফিশ ফ্রেন্ডলি স্ট্রাকচার তৈরি করা যেতে পারে। এতে প্রজননযোগ্য মাছ নদী থেকে বিলে এবং বিল থেকে নদীতে সুষ্ঠুভাবে পরিভ্রমণ ও প্রজনন করতে পারবে,

(গ) - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভিতর স্লুইস গেট দিয়ে প্রয়োজন মতো পানি ঢুকিয়ে সমন্বিত পদ্ধতিতে ধান ও মাছচাষ করা যেতে পারে,

(ঘ) - কৃষি জমিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থাপনা হলো সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা IPM (Integrated Paste Management)-এর মাধ্যমে রোগ বালাই প্রতিরোধ বা দমনের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) - সেচের জন্য পানি ব্যবহারে সংযমী হওয়া। মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয় এমন স্থান হতে পানি সেচ নিষিদ্ধ করা। সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা,

(চ)- অতি আহরণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো। অতি আহরণ রোধকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে মেনে চলা,

(ছ) - দূষণ প্রতিরোধকল্পে পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা,

(জ) - শিল্প স্থাপনের পূর্বেই বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা শিল্প স্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক করা,

(ঝ) - অপরিশোধিত পয়ঃ কোনো অবস্থাতেই মুক্ত জলাশয়ে যেন না যায় তার ব্যবস্থা করা এবং

(ঞ) - মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য মৎস্য বিভাগীয় অবকাঠামো ও জনশক্তি বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

১.৭ মাছ

মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা অভ্যন্তরীণ ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। মাছ কর্ডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপ-পর্বের অসটিক্থিস (Osteichthys) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র-১.১৮ মাছ

মাছের বৈশিষ্ট্য:

মাছের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হলো-

(ক) মাছ পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে তার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

(খ) মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

(গ) মাছের জীবন ধারণের মাধ্যম হলো পানি।

(ঘ) পাখনার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে মাছ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

মাছের প্রকারভেদ:

খাদ্য গ্রহণের ওপর ভিত্তি করে মাছকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন-

(ক) উদ্ভিদভোজী (Harbivorus): এই শ্রেণির মাছেরা জলজ ছোট ছোট উদ্ভিদ ও উদ্ভিদকণা অথবা এর পঁচাগলা অংশ অথবা ফাইটোপ্ল্যাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পায় ও বংশ বিস্তার করে। যেমন- সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি।

(খ) মাংসাশী (Carnivorus): মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী (জুপ্ল্যাংকটন) থেকে শুরু করে জীবের দেহাংশ বা পঁচাগলা প্রাণীদেহই এদের পছন্দের এবং প্রধান খাবার। শিং, মাগুর, কৈ, টাকি, ফলুই ইত্যাদি এই দলভুক্ত।

(গ) রাক্ষুসে/খাদক মাছ (Predator): এরা মাংসাশী। এরা বস্তুত মাংসের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং জলজ প্রাণী, ছোট মাছ, মাছ-মাংসের অংশ রাক্ষসের মতো খায়। এদের দৌরাত্মে পুকুরে বা জলাশয়ে অন্যান্য ছোট মাছের জীবন আতংকিত ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বোয়াল, চিতল, শোল, গজার রাক্ষুসে/খাদক মাছের উদাহরণ।

(ঘ) সর্বভুক (Omnivorus): এই জাতীয় মাছ বস্তুত সব রকম খাবারই খায়। এদের নিজস্ব পছন্দের খাবার পোকামাকড় হলেও এরা প্রয়োজনে উদ্ভিজ্জ খাবার খেয়ে থাকে। আবার যারা মূলত উদ্ভিদভোজী প্রয়োজনে তারা পোকামাকড় বা জুপ্ল্যাংকটন খেয়ে থাকে। অধিকাংশ মাছই তাদের ছোট অবস্থায় জুপ্ল্যাংকটন খেতে পছন্দ করে এবং বড় হয়ে প্ল্যাংকটন বা অন্য খাবার খায়। যেমন- কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।

সকল মাছের একই রকম খাদ্য যেমন পছন্দ নয় তেমনই সব মাছই জলাশয়ের একই স্তরে থাকে না। জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে মাছের খাদ্য সংগ্রহের ভিন্নতার উপর মাছকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) উপরিস্তরের মাছ: যে সকল মাছ সাধারণত জলাশয়ের উপরিস্তরে অবস্থান করে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে উপরিস্তরের মাছ বলে। জলাশয়ের উপরের স্তর প্রধানত সূর্যের আলো প্রবেশ করে ফলে প্রচুর ফাইটোপ্ল্যাংকটন তাদের ক্লোরোফিলের সাহায্যে খাবার সংগ্রহ করে ও বংশ বিস্তার করে। এ সকল স্তরে সাধারণত ফাইটোপ্ল্যাংকটন ভোজী যেমন- কাতলা মাছ, সিলভার কার্প ইত্যাদি এই স্তরের বাসিন্দা।

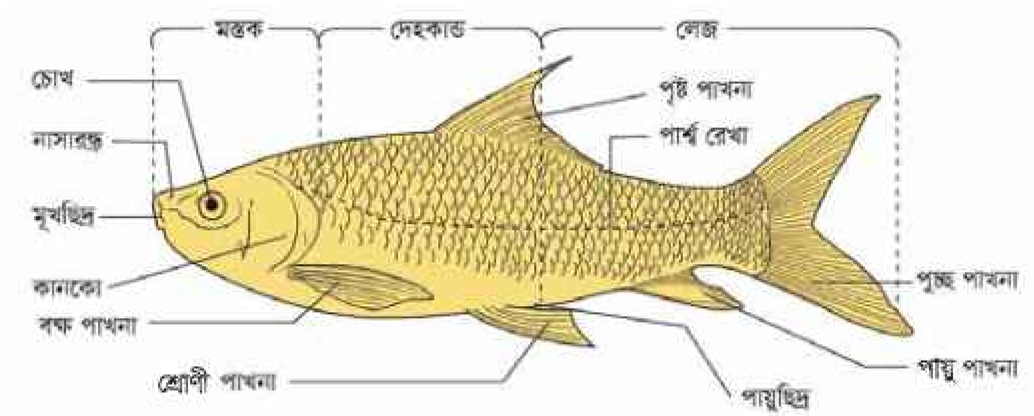
(খ) মধ্যস্তরের মাছ: যে সকল মাছ সাধারণত জলাশয়ের মধ্যস্তরে অবস্থান করে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে মধ্যস্তরের মাছ বলে। এখানে জলস্রোত ও জল-তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। মাছের জন্য প্রয়োজনীয় জুপ্ল্যাংকটন ও অক্সিজেন উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। এই স্তরের বাসিন্দা হলো- রুই মাছ, গ্রাস কার্প, বাটা মাছ ইত্যাদি।

(গ) নিম্নস্তরের মাছ: যে সকল মাছ সাধারণত জলাশয়ের তলদেশে অবস্থান করে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে নিম্নস্তরের মাছ বলে। জলাশয়ের এ অঞ্চলে স্রোত প্রায় নিস্তেজ। জলাশয়ের নিম্নস্তরে জলজ ক্ষুদ্র প্রাণীর পচা-গলা দ্রব্যাদি বেশি থাকে। এই স্তরে মৃগেল, শিং, মাগুর, কৈ, ল্যাটা, শোল, ইত্যাদি মাছের বসবাস।

১.৮ মাছের অংগসংস্থান সম্পর্কে ধারণা

আমাদের দেশে প্রাপ্ত সকল মাছই বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা যায় না। আবার চাষ করলেও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না। যেহেতু একটা জলাশয়ে নির্ধারিত কতিপয় প্রজাতির মাছচাষ করা যায় এবং সব প্রজাতির মাছচাষ করা যায় না, তাই যে প্রজাতির মাছচাষ করা হবে তার জীবন-বৃত্তান্ত না জানলে সঠিকভাবে মাছের পরিচর্যা করা যায় না, যেমন- যে মাছের যে রকম খাদ্যাভ্যাস তাকে সে ধরণের খাদ্য না দিয়ে অন্য খাদ্য দিলে ঐ খাদ্য ঐ মাছের কোন কাজে লাগেনা, পক্ষান্তরে মৎস্যচাষীর ব্যয় বাড়ে। আবার সকল মাছের শারীরিক গঠন এক রকম নয়। যেমন- কোনো মাছের শরীর আঁইশ দ্বারা আবৃত (কার্প জাতীয়), আবার কোনো মাছের শরীরে কোনো আঁইশ নাও থাকতে পারে (ক্যাট ফিশ)। তাই মৎস্যচাষী বা মৎস্য সেক্টরে জ্ঞান আহরণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার্থে নিচে মাছের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

(ক) মাছের বাহ্যিক অংগসমূহ (External Morfology)



চিত্র-১.১৯ মাছের বাহ্যিক অংগসমূহ

মাথা: মাছের মাথা শরীরের প্রধানতম অঙ্গ। অধিকাংশ মাছের মাথা ত্রিকোণাকৃতির এবং দুই পাশে চাপা। কিছু কিছু মাছের মাথায় আঁইশ থাকে এবং দেখতে কিছুটা সাপের মতো বলে এদেরকে Snake head বলে।



চিত্র-১.২০ মাছের মাথা

মাছের মাথার সম্মুখভাগে মুখছিদ্র বা মুখ, মুখের ঠিক পিছনে নাসারন্ধ্র অবস্থিত। সাধারণত মাছের দুটি নাসারন্ধ্র থাকে। এ নাসারন্ধ্রের সাহায্যে মাছ ঘ্রাণ নেয়, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় না।

চোখঃ মাথার দুই পার্শ্বে দুটি গোলাকার চোখ বিদ্যমান থাকে। মাছের চোখে কোনো পর্দা নেই ফলে মাছ কখনোই চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে পারে না। তবে চোখের উপর স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত থাকায় পানিতে কোনো ভাসমান কণা চোখের ক্ষতি করতে পারে না।



চিত্র-১.২১ মাছের চোখ

কানকোঃ মাছের মাথার দু'পাশে ফুলকার উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতির পাতলা শক্ত দুটি ঢাকনা থাকে। এ অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঢাকনাকে অপারকুলাম বা কানকো বলে। কানকোর নিচে নরম পর্দা লাগানো থাকে যা ফুলকা প্রকোষ্ঠকে ভালোভাবে বন্ধ করতে সাহায্যে করে। কানকোর সাহায্যে মাছ ইচ্ছেমতো ফুলকা প্রকোষ্ঠ খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। এছাড়াও মুখ দ্বারা গৃহীত অতিরিক্ত পানি এ পথে বের করে দিতে পারে।



চিত্র-১.২২ কানকো

২০২৫

স্পর্শী বা শুঁড়: কিছু কিছু মাছের মুখে ঠোঁটের উপরে ও নিচে কোমল সুতার ন্যায় জোড় সংখ্যক লম্বা, নলাকৃতি যে অঙ্গ দেখা যায় তাকে শুঁড় বা বার্বেল বলে। শিং, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল, প্রভৃতি মাছের মুখে শুঁড় রয়েছে। ইংরেজিতে আঁইশবিহীন, শুঁড় ও তিন কাঁটাবিশিষ্ট মাছকে Cat Fish বলে। শুঁড় মাছের খাবার খুঁজতে ও কোনো বস্তুর অবস্থান ও প্রকৃতি জানতে সহায়তা করে।



চিত্র-১.২৩ মাছের শুঁড়

পার্শ্বরেখা: মাছের কানকো থেকে লেজ পর্যন্ত শরীরের দু'পাশে দুটি রেখা দেখা যায়। এ রেখাকে পার্শ্বরেখা বলে। কোনো কোনো মাছে রেখাটি আগাগোড়া স্পষ্ট দেখা যায়। আবার কোনো কোনোমাছের রেখার সম্পূর্ণ অংশ বুঝা যায়না। পার্শ্বরেখা মাছের জন্য অনুভূতি নিরুপণ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এ রেখা দ্বারা মাছ পানির নড়াচড়া, স্রোত, পানির চাপ ইত্যাদি বুঝতে পারে।



চিত্র-১.২৪ পার্শ্বরেখা

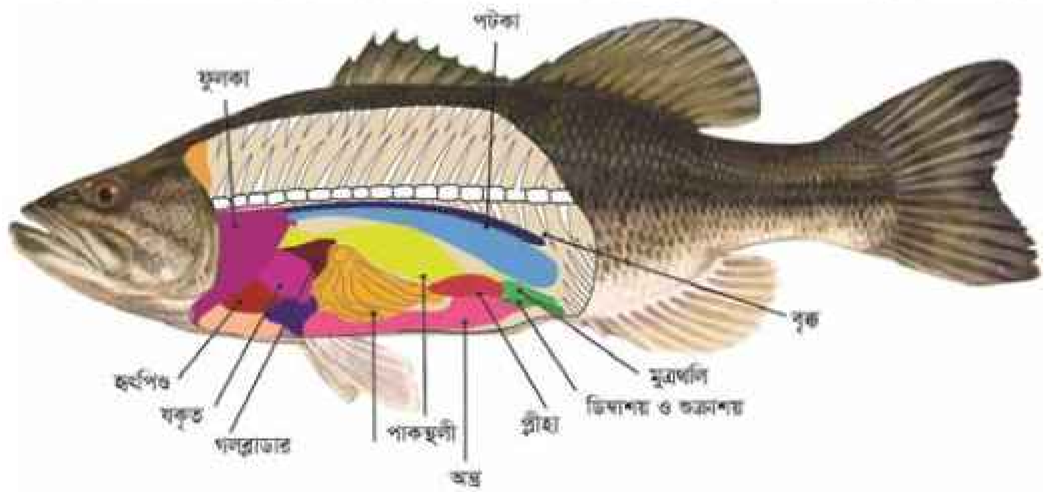
২০২৫

আঁইশ: অধিকাংশ মাছের দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। আঁইশ মাছকে বিভিন্ন রকম রোগজীবাণু ও পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা করে। আঁইশের উপরে এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ বিদ্যমান থাকে যাকে মিউকাস বলে। এ পিচ্ছিল আবরণ মাছের শরীরের রোগ বালাই ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় আঁইশ দেখে মাছের বয়স নির্ণয় করা হয়।

রেচন জনন ছিদ্র বা পায়ু: মাছের দেহ শেষ হয়ে লেজ শুরু হওয়ার সীমানায় একটি ছিদ্র বিদ্যমান। এ ছিদ্রের মাধ্যমে মাছ বিপাকীয় অবশিষ্টাংশ দেহের বাইরে নির্গত করে এবং প্রজনন কার্য পরিচালনা করে থাকে। এ কারণে এ ছিদ্র রেচন-জনন ছিদ্র নামে পরিচিত।

খ) মাছের অভ্যন্তরীন অংগসমূহ:

মাছের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগবালাই, খাদ্যগ্রহণ, খাদ্যের উপাদান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যেসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় সেগুলো হলো।



চিত্র-১.২৫ মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রতঙ্গ

ফুলকা: মাছের মাথায় কানকোর নিচে ফুলকার অবস্থান। মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ফুলকা ব্যবহৃত হয়। মাথার দুই পাশে কানকোর নিচে ৪ থেকে ৫ জোড়া ফুলকা দেখতে পাওয়া যায় যা টকটকে লাল রঙের।

পাকস্থলী: মাছের উদর ব্যবচ্ছেদ করলে নাড়ি-ভূঁড়ি দেখা যায়। এ নাড়ি-ভূঁড়ি হচ্ছে মাছের খাদ্যনালি। খাদ্যনালির যে অংশ মুখ গহ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে পাকস্থলী বলে। খাওয়ার পরে প্রাথমিকভাবে পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু জমা হয়।

অন্ত্র: খাদ্যনালির পাকস্থলীর পরের অংশ থেকে পায়ু পর্যন্ত অংশকে অন্ত্র বলে। অন্ত্রে হজমকৃত খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষিত হয়।

হৃৎপিণ্ড: পাকস্থলীর কাছাকাছি ছোট্ট যে অঙ্গের অবস্থান তা হৃৎপিণ্ড। মাছের দেহে রক্ত সঞ্চালনের মূল কেন্দ্র হিসেবে হৃৎপিণ্ড কাজ করে।

গলব্লাডার: সব মাছের গলব্লাডার বা পিত্তথলি সহজে চেনা যায় না। তবে বড় বড় আকারের মাছে পাকস্থলীর নিচে গলব্লাডারের অবস্থান বুঝা যায়। পিত্তরস সরবরাহ করা গলব্লাডারের কাজ।

যকৃৎ: হৃৎপিণ্ড ও গলব্লাডারের মাঝখানে যকৃতের অবস্থান। তামা রঙের যকৃৎ মাছের রক্তে বিভিন্ন নির্যাস নিঃসৃত করে।

পটকা: মাছের দেহ গহ্বরে বেলুন সদৃশ্য পটকা খুব সহজে চেনা যায়। পটকার সাহায্যে মাছ পানির মধ্যে ভেসে থাকতে পারে।

বৃক্ক: পটকার ওপরে অবস্থিত এবং মাছের মেরুদণ্ডের সাথে বৃক্ক লেগে থাকে। বৃক্ক শরীরের মধ্য থেকে বর্জ্য মলমূত্রের সাথে বের করতে সাহায্য করে।

ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়: প্রজননযোগ্য মাছের দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাশয় (স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে) বা শুক্রাশয় (পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে) সহজেই চেনা যায়। প্রজনন পরবর্তী সময়ে এ অঙ্গ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ডিম্বাশয়ে ডিম এবং শুক্রাশয়ে শুক্র তৈরি হয়।

অগ্ন্যাশয়: যকৃতের সাথে সংযুক্ত খুব ছোট গ্রন্থিকে অগ্ন্যাশয় বলে। মাছের দেহে বিভিন্ন রস নিঃসরণ করা অগ্ন্যাশয়ের কাজ।

১.৯ মাছের শ্রেণিবিন্যাস

অধ্যাপক সিম্পসনের মতে, শ্রেণিবিন্যাস হচ্ছে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কোনো প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে কতগুলো স্তরে সুষ্ঠিতভাবে সাজানোর এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বিশ্বে প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এদের প্রত্যেকের আকার, আকৃতি, বর্ণ, বাসস্থান, প্রজনন স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস সবই আলাদা। এক প্রজাতির মাছের সঙ্গে অন্য প্রজাতির মিল নেই বললেই চলে। বিশাল এ পরিমণ্ডলের সবগুলো মৎস্য প্রজাতির জীবন বৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানা সম্ভব নয় বিধায় বৈজ্ঞানিকগণ নামকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে নামকরণের একটি পদ্ধতি বের করেন যা দ্বিপদী নামকরণ (Binomial System of Nomenclature) নামে পরিচিত। যেখানে প্রত্যেকটি জীবের তথা মাছের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের দুটি অংশ থাকবে। প্রথম অংশ 'গণ' এবং দ্বিতীয় অংশ 'প্রজাতি'। নিচে কার্পজাতীয় মাছের প্রতিনিধি হিসেবে রুই মাছের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো-

রুইমাছের শ্রেণিবিন্যাস:

পর্ব (Phylum): Chordata
শ্রেণি (Class): Osteichthys
বর্গ (Order): Cypriniformes

গোত্র (Family): Cyprinidae
গণ (Genus): *Labeo*
প্রজাতি (Species): *Labeo rohita*

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য:

মাছের সুষ্ঠু এবং নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনার জন্য শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে -

- শনাক্তকরণ
- যথোপযুক্ত শ্রেণিতে মাছের প্রজাতিকে বিন্যস্ত করা
- নতুন নতুন তথ্য বা জ্ঞান আহরণ করা
- অন্যান্য প্রাণীর সাথে মাছের জাতিগত সম্পর্ক নির্দেশ করা

শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মাবলী:

শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব নিয়মাবলী পালন করতে হয় তা হলো-

(ক) বৈজ্ঞানিক নাম লেখার ক্ষেত্রে ইটালিক (Italic) হরফে অর্থাৎ বাঁকা ছাঁচের অক্ষরে মুদ্রিত হতে হবে।
অর্থাৎ লেখার সময় ডান দিকে কাত করে লিখতে হবে। যেমন- *Labeo rohita*

(খ) ইটালিক হরফে বা কাত করে লেখা সম্ভব না হলে 'গণ' এবং 'প্রজাতি' অংশের নিচে প্রত্যেকটি অক্ষর পর্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে দাগ টানতে হবে। যেমন- *Labeo rohita*

(গ) 'গণ' অংশের প্রথম অক্ষর ইংরেজি বড় হাতের (Capital letter) এবং প্রজাতি অংশের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের (Small letter) লিখতে হবে। যেমন- *Labeo rohita*

১.১০ বাংলাদেশে চাষযোগ্য কয়েকটি মাছের পরিচিতি

দেশের সব প্রজাতির মাছ বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা যায় না। আবার চাষ করলেও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না। তাই মৎস্য সেক্টরে জ্ঞান আহরণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার্থে নিচে প্রধান প্রধান চাষযোগ্য দেশী ও বিদেশী মাছের পরিচিতি দেয়া হলো।

ক) স্থানীয় নাম: রুই বা রুহিত

বৈজ্ঞানিক নাম: *Labeo rohita*

প্রাকৃতিক আবাস: বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে রুই মাছ অতি জনপ্রিয় ও স্বাদে শ্রেষ্ঠ। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় এদের সাধারণ আবাসস্থল। বর্ষাকালে প্লাবনভূমিতে ও ধানক্ষেতে এদের দেখা যায়। বর্তমানে পুকুরে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে এ প্রজাতির মাছটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পুকুর অপেক্ষা ধানক্ষেতে এদের দৈহিক বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: রুই মাছের দেহের আকৃতি অনেকটা মাকুর মতো। দেহ লম্বা ও দুই পাশে চাপা (Laterally flattend)। মাথা ও লেজ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। গোলাকার আঁইশ দ্বারা দেহ আবৃত। তবে এদের মাথায় কোন আঁইশ নেই। এদের মুখ প্রান্তিক এবং ঠোঁট জোড়া মোটা, নিচের

২০২৫

ঠোঁটটি বড় এবং উপরের ঠোঁট ছোট। চোয়ালে কোনো দাঁত নেই, তবে উপরের ঠোঁটে এক জোড়া ছোট শুঁড় আছে। এদের পৃষ্ঠ পাখনা বেশ লম্বা এবং পাখনায় ১৫ থেকে ১৬টি পাখনা রশ্মি আছে। পাখনার রং লালচে কালো। পুচ্ছ পাখনা গভীরভাবে বিভক্ত। পিঠের দুপাশের রং কালচে বাদামি তবে উদর রূপালি সাদা। রুই মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩৯২ সে. মি. এবং ওজন ৪৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পরিবেশের কোনো তারতম্য না হলে পুকুরে এদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রথম বছর সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।



চিত্র-১.২৬ রুই মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: এদের মুখ নিম্নমুখী ও ঠোঁট পুরু থাকায় এরা জলজ উদ্ভিদ, উদ্ভিদের নরম পাতা, পঁচা জলজ লতাপাতার অংশ, মাঝে মাঝে পুকুরের তলদেশ থেকে পঁচা জৈবিক পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এরা শুধু জুপ্ল্যাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ফাইটোপ্ল্যাংকটন গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে জুপ্ল্যাংকটন গ্রহণের পরিমাণ কমতে থাকে। এরা পানিতে ডুবন্ত লতাপাতা বা ডালে লেগে থাকা জৈব পদার্থ, ধানক্ষেতে ধান গাছের গায়ে লেগে থাকা শ্যাওলা প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। তাই অনেক সময় পুকুরে মাছ চুরি ঠেকানোর জন্য পুঁতে রাখা বাঁশ বা কঞ্চিতে লেগে থাকা শ্যাওলা রুই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাধারণত এরা পানির মধ্যস্তরে বসবাস করে এবং পানির মধ্যস্তর হতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। চাষকৃত পুকুরে পিলেট জাতীয় সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে রুই মাছের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

প্রজনন: রুই মাছ দুই বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। জুন-আগস্ট মাসে এরা প্রজনন করে থাকে। রুই মাছ সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। তবে বদ্ধ জলাশয়ে কৃত্রিমভাবে স্রোতের সৃষ্টি করলে এরা প্রজনন করে থাকে। প্রবাহমান নদীতে এরা সহজেই প্রজনন করে থাকে। আধুনিক পদ্ধতিতে অতি সহজেই হ্যাচারিতে এদের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ করা যেতে পারে। এদের ডিম দেখতে গোলাকার এবং লালচে রঙের। একটি পরিপক্ক স্ত্রী রুই মাছ বছরে ৩-৪ লক্ষ ডিম দিয়ে থাকে।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম রুই মাছে ১৬.৪ গ্রাম আমিষ, ১.৪ গ্রাম চর্বি, ৬০০ মিগ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ২২৩ মি.গ্রা. ফসফরাস থাকে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: রুই মাছ ২ বছরে ২-৩ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং তখনই এ মাছ আহরণ করে বাজারজাত করা যেতে পারে। খেপলা জাল, বেড় জাল, ফাঁস জাল প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই এ মাছ

আহরণ করা যেতে পারে। তবে মৎস্য শিকারীদের জন্য ছিপ বা বড়শি দিয়ে রুই মাছ শিকার অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

খ) কাতলা

স্থানীয় নাম: কাতলা বা কাতল

বৈজ্ঞানিক নাম: *Catla catla*

প্রাকৃতিক আবাস : কাতলা মাছ আমাদের দেশের জনপ্রিয় মাছ। রুই মাছের মতো নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও মুক্ত জলাশয় এদের প্রাকৃতিক আবাস। বর্ষাকালে এদেরকে ধানক্ষেতে পাওয়া যায়। বদ্ধ পানিতেও এরা বাস করতে পারে বলে সারা দেশে চাষযোগ্য সব পুকুর-দিঘিতে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ হিসেবে চাষ করা হয়ে থাকে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমাদের দেশের বাইরে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও মায়ানমার কাতলা মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: কাতলা মাছের মাথা দেহের তুলনায় বড়, দেহ চওড়া ও দুই পার্শ্বে চ্যাপ্টা, মুখ প্রান্তিক, ঊর্ধ্বমুখী ও বেশ বড়। উপরের চোয়াল নিচের চোয়ালের চেয়ে ছোট। চোয়ালে কোন দাঁত নেই। প্রশস্ত কানকো দ্বারা ফুলকা প্রকোষ্ঠ আবৃত। সমস্ত শরীর বড় বড় গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। তবে এদের মাথায় কোনো আঁইশ নেই। মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দু'পাশে দুটি পার্শ্বরেখা থাকে। কাতলা মাছের পিঠের মাঝখানে প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাখনা, বিভক্ত পুচ্ছ পাখনা, পায়ু পাখনা এবং জোড়া বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনা বিদ্যমান। পৃষ্ঠ পাখনায় ১৭-২০টি পাখনা রশ্মি থাকে। কাতলা মাছের রং পিঠের দিকে কালচে বা ধূসর কিন্তু পেটের দিকে সাদা। কাতলা মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১৮০ সে.মি. এবং ওজন ৪৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং প্রয়োজনীয় খাবার পেলে এক বছরে ৪ কেজি এবং দুই বছরে ১০ কেজি পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে।



চিত্র-১.২৭ কাতলা মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: কাতলা মাছ পুকুরের উপরের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের মুখের উপরের চোয়াল ছোট হওয়ায় পানির উপরের স্তরের খাদ্য সহজেই এরা গ্রহণ করতে পারে। এরা সাধারণত সর্বভুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে জুপ্ল্যাংকটন অপেক্ষা ফাইটোপ্ল্যাংকটন বেশি পছন্দ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এরা পানিতে ভাসমান ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন খায়। বড় কাতলা শ্যাওলা, পঁচা জলজ উদ্ভিদ, ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এরা সাধারণত রাতে আহার করেনা। দুপুর থেকে সন্ধ্যা ১০৫

পর্যন্ত বিশেষ করে বিকেলে খাদ্য গ্রহণ করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকে। এদের মুখের গড়ন সম্পূরক খাদ্য গ্রহণের জন্য ততবেশি উপযোগী নয়। ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য এদের খাদ্য তালিকায় সম্পূরক খাদ্যের পরিবর্তে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাধান্য বেশি দেওয়া দরকার।

প্রজননঃ কাতলা মাছ বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। প্রবাহমান নদী ও মুক্ত জলাশয়ে এরা প্রজনন করে থাকে। সাধারণত মে মাস হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত বিভিন্ন নদ-নদীর নব্য প্লাবিত অগভীর অংশে কাতলা মাছ প্রজনন করে। এরা তৃতীয় বছরে প্রজননক্ষম হয় এবং বছরে একবারই ডিম দেয়। এদের ডিমগুলো ভাসমান বা আঠালোও নয়। এদের ডিমের রং হালকা লাল। ব্যাস ৪.৫ মি.মি. থেকে ৫.৫ মি.মি.। প্রজনন মৌসুম ব্যতিত পুরুষ ও স্ত্রী কাতলা মাছ শনাক্তকরণ বেশ কঠিন। প্রজনন মৌসুমে ভারী ও মোটা পেট দেখে স্ত্রী মাছ সহজেই চেনা যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে ডিম সংগ্রহ করে অথবা কৃত্রিম উপায়ে ইনজেকশন দিয়েও কাতলা মাছের পোনা উৎপন্ন করা যায়।

পুষ্টিমানঃ প্রতি ১০০ গ্রাম কাতলা মাছে ১৬.৪ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম চর্বি, ৫১৪ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ২১৪ মি. গ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণঃ সাধারণত বেড় জাল দিয়ে সহজেই কাতলা মাছ আহরণ করা যায়। তবে ঝাঁকি জাল, ভেসাল জাল প্রভৃতি দ্বারা পুকুর বা নদ-নদী হতে অতি সহজেই এ মাছ আহরণ করা যায়। ছিপ দিয়েও মাঝে মাঝে কাতলা মাছ ধরা পড়ে। বাজারে বড় কাতলা মাছের চাহিদা বেশি বিধায় দু'বছর বয়সেই কাতলা মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ করা উচিৎ।

গ) মৃগেল

স্থানীয় নাম : মৃগেল বা মিরকা

বৈজ্ঞানিক নাম : *Cirrhinus mrigala*

প্রাকৃতিক আবাস : মৃগেল মাছ স্বাদুপানির নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় প্রভৃতি জলাশয়ে পানির নিচের স্তরে বসবাস করে। এদের প্রাকৃতিক আবাস বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। আমাদের দেশে পুকুর-দিঘিতে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে রুই-কাতলার সাথে মৃগেল মাছ ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ধানক্ষেতে এ মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এরা কর্দমাক্ত জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করতে পছন্দ করে বিধায় পুরাতন পুকুরে এদের বৃদ্ধি নতুন পুকুরের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।



চিত্র-১.২৮ মৃগেল মাছ

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: মৃগেল মাছ লম্বাটে, দেহ পার্শ্বদেশে সামান্য চাপা, দেহের তুলনায় মাথা খুবই ছোট। এদের মুখ প্রান্তিক ও নিম্নমুখী। ঠোঁট দুটি পাতলা এবং চোয়ালে কোন দাঁত নেই। প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাখনা, ছোট পায়ু পাখনা, দ্বিখন্ডিত পুচ্ছ পাখনা এবং জোড়া বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা বিদ্যমান। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১৫-১৬টি পাখনা রশ্মি বিদ্যমান। এদের দেহ মাঝারী গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। ছোট মাছ সাদা বা রূপালি রংয়ের তবে পাখনাগুলো দেখতে লালচে রঙের। মাছ বড় হলে পিঠের দিকে ধূসর হয় ও দুপাশ ও পেট রূপালি রঙের হয়। এ মাছের চোখ দেখতে সোনালি রঙের। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১০০ সে.মি. এবং ওজন ১৩ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: মৃগেল মাছ জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের মুখ ও ঠোঁট দুটো পাতলা হওয়ার কারণে অতি সহজেই তলদেশ হতে পঁচা-গলা জৈব পদার্থ, উদ্ভিদের পচা অংশ, কাদার ভিতরে বসবাসকারী ছোট ছোট বেনথোস ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা বাছাই করে খাওয়ার মতো ফুলকা রশ্মি (Gill filament) থাকায় এরা জলাশয় থেকে প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য বাছাই করে খেতে পারে।

পুকুরের তলদেশে কাদার মধ্যে বিদ্যমান খাদ্যকণা খুঁজে খায় বলে মৃগেল মাছে কখনো কখনো কাদার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ফলে অনেকে মৃগেল মাছ খেতে পছন্দ করে না। মৃগেল মাছ রুই কাতলার তুলনায় ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত প্রথম বছরে এরা গড়ে ২৫০-৩৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। তাই এক বছরের কম বয়সের মৃগেল মাছ ধরা ও বাজারজাত করা উচিত নয়। পুকুরে চাষের সময় এরা সম্পূরক খাবার, যেমন- খৈল, কুঁড়া, ভুষি মিশ্রিত বল বা পিলেট খাবার খেতে বেশ পছন্দ করে এবং এ খাদ্য গ্রহণে আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

প্রজনন: রুই ও কাতলার মতো মৃগেল মাছও বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। নদ-নদী ও মুক্ত জলাশয়ে এরা প্রজনন করে থাকে। সাধারণত দুই বছর বয়সে মৃগেল মাছ প্রজননক্ষম হয়। মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মৃগেল মাছ প্রজনন করে থাকে। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বর্ষাকালে সদ্য প্লাবিত অগভীর এলাকায় এরা প্রজনন করতে চলে আসে। হ্যাচারিতে খুব সহজেই হরমোন ইনজেকশন দ্বারা কৃত্রিমভাবে প্রজনন করানো যায়। এদের ডিম আঠালো বা ভাসমান নয়। ডিমের ব্যাস ৫.৫ মি.মি.।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম মৃগেল মাছে ১৯.৫ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম চর্বি, ৩৩৫ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩৮২ মি.গ্রা. ফসফরাস বিদ্যমান থাকে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: সব ধরনের জাল দিয়ে মৃগেল মাছ আহরণ করা যায়। তবে তলদেশে বসবাসকারী মাছ হিসেবে বেশি কাদাযুক্ত জলাশয়ে মৃগেল মাছ বেড় জালে খুব একটা বেশি ধরা পড়ে না। কারণ এরা সহজে কাদার মধ্যে মাথা গুজে দেয়, ফলে জালে আটকায় না। জাল দেহের উপর দিয়ে চলে যায়। তবে মৃগেল মাছ বড়শি দ্বারা আহরণ করা সহজ। মৃগেল মাছের বয়স যখন কমপক্ষে এক বছর হবে তখনই তা বাজারজাত করা উচিত।

২০২৫

ঘ) কালিবাউস

স্থানীয় নাম: কালিবাউস বা বাউস
বৈজ্ঞানিক নাম: *Labeo calbasu*

প্রাকৃতিক আবাস: বাংলাদেশসহ ভারতের নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল এদের আবাসস্থল। বদ্ধ পানি অপেক্ষা প্রবাহমান পানি এদের জন্য বিশেষ উপযোগী। এরা সাধারণত জলাশয়ের কর্দমাক্ত তলদেশ পছন্দ করে। রুই-কাতলা মাছের সাথে পুকুরে এ মাছ চাষ করা যায়।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: কালিবাউস মাছের দেহের রং পিঠের দিকে ঘন কালো এবং পেটের দিকে ক্রমশ ধূসর সাদা। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। এদের চোখ লাল রঙের, মুখ প্রান্তিক ও নিম্নমুখী, ঠোঁট কিছুটা ঝুলন্ত। ঠোঁটের উপরে ও নিচে দুই জোড়া ছোট কালো রং এর স্পর্শী বা শুড় আছে যার একটি আর একটি অপেক্ষা একটু বড়। এদের দেহ মাঝারী ধরনের, কিছুটা গোলাকার। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১৬-১৮টি পাখনা রশ্মি বিদ্যমান থাকে এবং পুচ্ছ পাখনা গভীরভাবে দ্বিখন্ডিত। এদের বৃদ্ধির হার অন্যান্য মাছের তুলনায় কম। এদের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৯২ সে.মি. এবং ওজন ৯ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সাধারণভাবে প্রাপ্ত বেশির ভাগ মাছ ২০-৩০ সে.মি. এবং ১.০ - ১.৫ কেজি হতে দেখা যায়। দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। দেহের দুই পাশে পার্শ্বরেখা থাকে।



চিত্র-১.২৯ কালিবাউস মাছ

খাদ্য ও খাদ্যভ্যাস: কালিবাউস মাছ পানির নিচের স্তরে বসবাস করে এবং এদের মুখ নিম্নমুখী বলে তলদেশে বিদ্যমান খাদ্য সহজে গ্রহণ করে থাকে। পোনা অবস্থায় এরা এককোষী শ্যাওলা, পঁচা ও আধাপঁচা জলজ উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গ খায়। পরিণত বয়সে পঁচা ও আধাপঁচা জলজ উদ্ভিদ খায়। জলাশয়ের তলদেশে কাদার মধ্যে যেসব পোকামাকড় বা বিভিন্ন শুককীট থাকে যাদেরকে বেনথোস বলে। কালিবাউস মাছ বেনথোস খেতে খুব বেশি পছন্দ করে।

প্রজনন: মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে নদ-নদীর প্রবাহমান পানিতে কালিবাউস মাছ প্রজনন করে। সাধারণত দুই বছর বয়সে এরা প্রজননক্ষম হয়। বর্ষার নতুন প্লাবিত অগভীর অঞ্চলে প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ প্রজননের জন্য উঠে আসে। স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ার পর পুরুষ মাছ ডিমকে বাহ্যিকভাবে নিষিক্ত করে।

এদের ডিম ভাসমান নয়। ডিমের রং ঈষৎ নীল। ডিমের ব্যাস ৩ মি.মি. থেকে ৪ মি.মি.। হ্যাচারিতে হরমোন ইনজেকশান প্রয়োগ করে কালিবাউস মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণুপোনা উৎপাদন করা হয়।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম কালিবাউস মাছে আমিষ ১৫.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৩৫ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ৩৮২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করা যায়। এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল নয় বলে প্রথম বছর এ মাছ আহরণ না করাই ভালো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এ মাছ আহরণ ও বাজারজাত করা যেতে পারে।

ঙ) সিলভার কার্প

স্থানীয় নাম: সিলভার কার্প

বৈজ্ঞানিক নাম: *Hypopthalmichthys molitrix*

প্রাকৃতিক আবাস : সিলভার কার্প মাছের আদি বাসস্থান চীন দেশের ইয়াংসি নদীতে। ১৯৬৩ সালে স্বাদুপানির মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, চাঁদপুর প্রথম এ মাছটি বিদেশ থেকে আমদানি করে। বর্তমানে চীন, রাশিয়া ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পুকুরে চাষ উপযোগী মাছ হিসেবে এ মাছ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের দেশের রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের মতো এরা নদীতে ও পুকুরে উভয় স্থানেই বসবাস করতে পারে। তবে নদীর চেয়ে পুকুরে এদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। দ্রুত বর্ধনশীল মাছ হিসেবে রুই-কাতলা মাছের সাথে সিলভার কার্পের মিশ্রচাষ করা হয়।



চিত্র-১.৩০ সিলভার কার্প

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: সিলভার কার্প দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতো বলে অনেকে এ মাছটিকে পুকুরের ইলিশ নামে অভিহিত করে থাকেন। তবে মাথা ইলিশের তুলনায় একটু বড়। এদের মুখ প্রান্তিক, নিচের ঠোঁট সামান্য বাড়ানো। দেহ দুই পার্শ্বে চাপা, মাথা ও লেজের দিক সরু পেটের দিক পিঠের চেয়ে উত্তল। এদের দেহ ছোট ছোট রূপালী আঁইশ দ্বারা আবৃত। পিঠের দিকের রং গাঢ় ধাতব রঙের, তবে অন্যান্য অংশ রূপালি রঙের। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১০টি পাখনা রশ্মি আছে।সিলভার কার্প ভালো ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে বছরে ২ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ২০ কেজি ওজনের সিলভার কার্প পাওয়া গেছে। ২০২৫

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: সিলভার কার্প প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে পানির উপরের স্তরের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আবার বাহির থেকে সরবরাহকৃত খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এরা ক্ষুদ্র শৈবাল খায় এবং বড় হলে ফাইটোপ্ল্যাংকটন, পচাঁ জলজ উদ্ভিদ, উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ খেয়ে থাকে। সিলভার কার্পের অন্ত্র দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ৮-১০ গুণ লম্বা হয়ে থাকে এবং এদের ফুলকায় সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম অনেক ফুলকা রশ্মি রয়েছে বিধায় এরা অধিক পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাইটোপ্ল্যাংকটন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এরা পানিতে ভাসমান প্ল্যাংকটন ফুলকার সাহায্যে ছেঁকে খেতে সক্ষম বিধায় যেসব জলাশয়ে অধিক পরিমাণে প্লাঙ্কটন জন্মানোর কা ণে পানি রঙ ঘন সবুজ দেখায়, বা সবুজ আস্তর পড়ে, সেসব জলাশয়ে সিলভার কার্প মজুদ করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

জলাশয়ের অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও শ্যাওলা বৃদ্ধির কারণে যে অ্যালগাল ব্লুম (Algal bloom) সৃষ্টি হয় তা নিয়ন্ত্রণে সিলভার কার্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু এ মাছ অ্যালগাল ব্লুম (Algal bloom) নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তথা পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখতে সহায়তা করে, তাই এ মাছকে পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপক (Water quality manager) বলে। এরা পানির উপরিভাগের খাদ্য গ্রহণ করে বলে অনেক সময় কাতলার সঙ্গে খাদ্যজনিত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, ফলে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কাতলার আশানুরূপ ফলন নাও পাওয়া যেতে পারে।

প্রজনন: সিলভার কার্প মাছ দ্বিতীয় বছরে প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে এদের প্রজনন করানো হয়। সাধারণত এপ্রিল হতে জুলাই মাস পর্যন্ত এ মাছ প্রজনন করে থাকে।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম সিলভার কার্প মাছে আমিষ ২০ গ্রাম, চর্বি ১.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৫০ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ৩৮২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: উপরের স্তরের মাছ হওয়ায় সিলভার কার্প আহরণ খুবই সহজ। বেড় জাল, ঝাঁকি জাল ইত্যাদি দিয়ে অতি সহজেই পুকুর হতে সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করা যায়। বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার কার্প মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। প্রথম বছর গড়ে ১.৫ কেজি এবং দ্বিতীয় বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য পরে বৃদ্ধির এ হার কমে যায়। তাই সিলভার কার্পের বয়স যখন এক থেকে দেড় বছর হবে তখনই সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করে বাজারজাত করা ভাল।

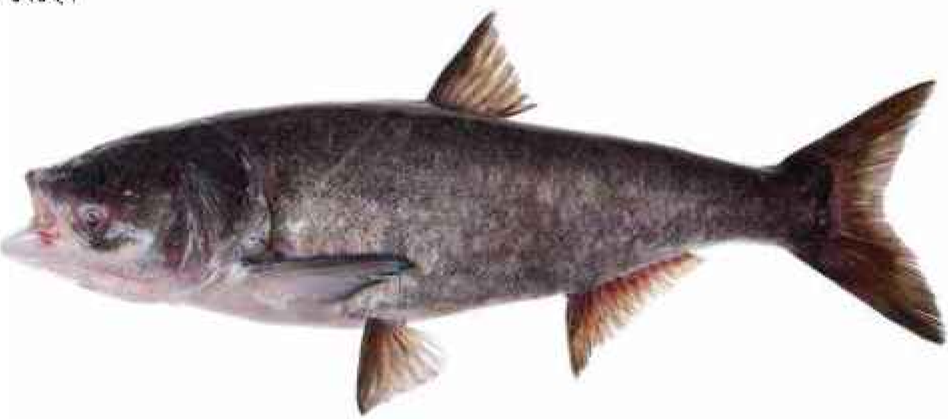
চ) বিগহেড

স্থানীয় নাম: বিগহেড

বৈজ্ঞানিক নাম: *Aristichthys nobilis*

প্রাকৃতিক আবাস: বিগহেড মাছের আদি বাসস্থান চীন দেশ। ১৯৮১ সালে নেপাল থেকে এ মাছটি আমাদের দেশে আনা হয়। এ মাছ সিলভার কার্পের চেয়েও দ্রুত বর্ধনশীল। এ মাছ পুকুর খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরিস্তরে বাস করে থাকে।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: বিগহেড নামের অর্থই হলো বড় মাথাওয়ালা মাছ। অর্থাৎ দেহের তুলনায় মাথা অনেক বড়। ঠোঁট সরু এবং খাট, চোখ ছোট এবং মাথার মধ্যস্থলে শরীরের পার্শ্বরেখা বরাবর অবস্থিত। ফুলকা রশ্মি ঘন এবং দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ দ্বারা আবৃত। পিঠের দিকের রং হালকা কালচে, মাঝে মাঝে বৃত্তাকার হলুদ ও কালো দাগ দেখা যায়। গলবিলে একসারি দাঁত বিদ্যমান। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল। চাষের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করলে এক বছরে এ মাছ ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। সর্বোচ্চ ৪০ কেজি পর্যন্ত এ মাছ পাওয়া গেছে।



চিত্র-১.৩১ বিগহেড

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: বিগহেড পানির উপরের স্তরের খাদ্য খেয়ে থাকে। এরা মূলত প্রাণী প্ল্যাংকটন ভোজী, এদের ফুলকায় বিদ্যমান ফুলকা রশ্মি খুব ঘনভাবে সাজানো থাকে বিধায় সহজে পানি থেকে প্রাণী প্ল্যাংকটন ছেঁকে খেতে পারে। প্রাণী প্ল্যাংকটনের মধ্যে রোটিফার, নপ্লিয়াস, কপিপড প্রভৃতি প্রধান। সরবরাহকৃত খাদ্যের মধ্যে চালের কুঁড়া, খৈল, পঁচা জলজ উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এদের অন্ত্র দেহের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ লম্বা। এরা কাতলার সাথে খাবার ও বাসস্থানের জন্য তীব্র প্রতিযোগীতা করে। তাই একই পুকুরে একই সঙ্গে, একই আকারের কাতলা ও বিগহেড এর পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। ভালো ফল পেতে হলে অবশ্যই বিগহেড এর তুলনায় বড় সাইজের কাতলার পোনা মজুদ করতে হবে।

প্রজনন: বিগহেড মাছ বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের প্রজনন ঘটানো হয়। সাধারণত মে হতে জুলাই মাস পর্যন্ত বিগহেড মাছের কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়ে থাকে। স্ত্রী বিগহেড ৩ থেকে ৪ বছর বয়সে এবং পুরুষ বিগহেড ২ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম বিগহেড মাছে আমিষ ২০ গ্রাম, চর্বি ১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪৭০ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ২৪২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: উপরের স্তরের মাছ হিসেবে খুব সহজেই বেড় জাল, ঝাঁকি জাল প্রভৃতি দ্বারা এ মাছ আহরণ করা যেতে পারে। এ মাছ এক বছর হতে দেড় বছরের মধ্যেই বাজারজাত করা যেতে পারে। কারণ এ সময়ে মাছের ওজন দেড় কেজি হতে আড়াই কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ছ) গ্রাসকার্প

স্থানীয় নাম: গ্রাসকার্প বা ঘেসো রুই

বৈজ্ঞানিক নাম: *Ctenopharyngodon idella*

প্রাকৃতিক আবাস: গ্রাসকার্পের আদি বাসস্থান চীন এবং রাশিয়া। চীন, হংকং এবং রাশিয়ার আমুর নদীতে এ মাছ পাওয়া যায়। ১৯৫৯ সালে হংকং থেকে এ মাছ আমাদের দেশে আনা হয়। গ্রাসকার্প মাছ জলজ আগাছাকে দ্রুত আমিষে রূপান্তরিত করতে সক্ষম বিধায় জলাশয়ের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্রাসকার্প মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল এবং শক্ত গড়নের। এরা ০° সে. তাপমাত্রা থেকে ৩৮° সে. তাপমাত্রায় ০.৫ পিপিএম দ্রবীভূত অক্সিজেনে এবং ১০ পিপিটি লবণাক্ততায় বসবাস করতে পারে। সুস্বাদু, দ্রুত বর্ধনশীল এবং চাষকালীন সময়ে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাথে এ মাছের মিশ্রচাষ করা হয়।



চিত্র-১.৩২ গ্রাসকার্প মাছ

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: গ্রাসকার্প মাছের দেহ মোটামুটি নলাকার। মাথা উপরের দিক থেকে কিছুটা চাপা, পৃষ্ঠদেশ সোজা পেটের দিকে মোটা ও ঝুলে পড়া। ঘাস খাওয়ার কারণে এদের অন্ত্র বেশ লম্বা হয় অর্থাৎ মাছের দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ লম্বা হয়। এদের মুখ প্রান্তিক, নিচের ঠোঁট সামান্য ছোট, এদের মুখ গহ্বর বা গলবিলে চিরুনির দাঁতের মত তীক্ষ্ম দুই সারি দাঁত আছে। ফলে অতিসহজেই জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে। শরীর বড় বড় গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। শরীরের রং পেটের দিকে রূপালি সাদা ও পিঠের দিকে কালচে ধূসর। এদের পৃষ্ঠপাখনায় ১০টি পাখনা রশ্মি আছে। প্রচুর ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ খেতে পেলে এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বছরে ৩-৪ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। গ্রাসকার্প সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: গ্রাসকার্পের নামকরণই এদের খাদ্যাভ্যাস বলে দেয় অর্থাৎ এরা ঘাস খেকো মাছ। ছোট অবস্থায় ফাইটোপ্ল্যাংকটন, শৈবাল ও ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। বড় হলে ঘাস, লতাপাতা, নরম জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি এরা খেয়ে থাকে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ক্ষুদিপানা, টোপাপানা, কচুরিপানার নরম অংশ প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। পুকুরে গ্রাসকার্পের খাদ্যের অভাব হলে পুকুর পাড়ের ঝুলন্ত কলাপাতা লাফিয়ে খেতে দেখা যায়। এরা প্রতিদিন এদের শরীরের ওজনের দ্বিগুণ পরিমাণ ঘাস খেতে পারে।

প্রজনন: গ্রাসকার্প মাছ দুই বছর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়েও এদের পরিপক্কতা আসে তবে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এরা বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। জুন-জুলাই মাসে হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে হ্যাচারিতে গ্রাসকার্পের কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়। একটি পরিপক্ক গ্রাসকার্প হতে প্রায় ২ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যায়।

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রামে ১৯.৫ গ্রাম আমিষ, ১.১ গ্রাম চর্বি, ১.১ গ্রাম লৌহজাত উপাদান থাকে। এ ছাড়াও ৩৩৫ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ৩৮২ মি.গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ: বেড় জাল, ঝাঁকি জাল, ফাঁস জাল প্রভৃতি দ্বারা গ্রাসকার্প মাছ আহরণ করা যেতে পারে। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় গ্রাসকার্প মাছ চাষ করলে বছরে ২ থেকে ৩ কেজি ওজনের মাছ পাওয়া যেতে পারে।

জ) থাই সরপুঁটি

স্থানীয় নাম: থাই সরপুঁটি বা রাজপুঁটি
বৈজ্ঞানিক নাম: *Barbonymus gonionotus*

প্রাকৃতিক আবাস: থাই সরপুঁটি ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরিস্তরে এ মাছটি বাস করে। দ্রুত বর্ধনশীল, সহজ ব্যবস্থাপনায় চাষযোগ্য এবং সুস্বাদু মাছ হিসেবে আমাদের দেশে এ মাছটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছোট ছোট মৌসুমী পুকুরে চাষের জন্য থাই সরপুঁটি অত্যন্ত উপযোগী মাছ। প্রতিকূল পরিবেশ অর্থাৎ কম অক্সিজেন, বেশি তাপমাত্রা ও ঘোলা পানিতে চাষের জন্য থাই সরপুঁটি বিশেষ উপযোগী।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: থাই সরপুঁটি দেখতে অনেকটা দেশি সরপুঁটির ন্যায়। তবে দেশি সরপুঁটির শরীর যতটা পুরু থাই সরপুঁটি সে তুলনায় পাতলা, এদের মুখ দেশি সরপুঁটির চেয়ে অনেকটা ভোতা। এদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল রুপালি। তবে পিঠের দিকের রঙ হালকা ধূসর। এ মাছের পৃষ্ঠ পাখনায় পাখনা রশ্মি কাঁটাযুক্ত এবং খাঁজ কাটা। ফলে জালটানার সময় পৃষ্ঠ পাখনায় জালের সুতা আটকে গেলে মাছ সহজে ছাড়া পায়না।



চিত্র-১.৩৩ থাই সরপুঁটি

এদের দেহ বড় বড় গোলাকার আইশ দ্বারা আবৃত ও মুখ গহ্বরে তিন সারি দাঁত বিদ্যমান। এদের অন্ননালি শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় দুই-তিন গুণ লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণত এক বছরে থাই সরপুঁটি ২৫০-৪০০ গ্রাম ওজনের হতে পারে। সর্বোচ্চ ১.৫ কেজি পর্যন্ত এ মাছ পাওয়া গেছে। এদের কোনো পাকস্থলী নেই। তাই অন্ননালির মধ্যেই খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: থাই সরপুঁটি সর্বভুক প্রকৃতির মাছ। তাই মাছের খাদ্যরূপে পরিচিত যে কোনো ধরনের খাবারই থাই সরপুঁটি খেতে পারে। রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শ্যাওলা এবং প্রাণী প্ল্যাংকটন গ্রহণ করে। পরিণত বয়সে এরা বড় ধরনের জলজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, গমের ভুষি প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো ক্ষুদিপানা বা ডাকউইড। সম্পূরক খাদ্য পেলে এ মাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।

প্রজনন: থাই সরপুঁটি মাছ এক বছর বয়সেই যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। এরা সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। তবে কোনো কারণে পুকুরে স্রোতের সৃষ্টি হলে অর্থাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হলে অনেক সময় বাড়ি ঘর বা উঠানের পানি, পাড় নিচু থাকলে মাঠ থেকে পানি পুকুরে ঢুকে পড়ে এবং পুকুরে যদি প্রজননক্ষম মাছ থাকে তাহলে অনেক সময় এরা পুকুরে প্রজনন করে। তবে অধিকাংশ সময় কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে এ মাছের প্রজনন করে পোনা উৎপাদন করা হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এ মাছ প্রজনন করে থাকে।

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম সরপুঁটি মাছে ১৯ গ্রাম আমিষ, ২ গ্রাম চর্বি ও ১৫০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ৯৯০ মি.গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ: এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ৫-৬ মাস লালন পালন করলে এ মাছ গড়ে ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের হয়। তখন বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করে বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে।

ঝ) পাঙ্গাস

স্থানীয় নাম: থাই পাঙ্গাস
বৈজ্ঞানিক নাম: *Pangasianodon hypophthalmus*

প্রাকৃতিক আবাস: থাই পাংগাস হচ্ছে মেকং নদীর ক্যাটফিস গোত্রভুক্ত একটি মাছ। বাংলাদেশে থাই পাংগাস বর্তমানে একটি ব্যাপক চাষকৃত মাছের প্রজাতি। নব্বই দশকে থাইল্যান্ড হতে আনা পাংগাসিয়াস সুচির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ব্যাপক পোনা উৎপাদন করে পুকুরে চাষ করা হয়। বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জলাশয়ে এই মাছ চাষ করা হয় এবং দেশের মোট মোট মৎস্য উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে পাংগাস মাছের অবদান।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: দেহ লম্বা ও চাপা। পৃষ্ঠ পাখনার পিছনের পৃষ্ঠদেশ প্রায় সোজা। মাথা নরম ত্বক দ্বারা আবৃত। প্রায় প্রান্তীয় (Terminal) মুখ বিদ্যমান। সম্মুখ নাসারন্ধ্র স্পষ্ট। দুই জোড়া ছোট শুঁড় আছে। চোঁয়ালে দাঁত থাকলেও তালুতে কোনো দাঁত নাই। পাখনা ছোট ও চর্বিযুক্ত। ফুলকা পর্দা সামনের দিকে পরস্পরের সাথে যুক্ত।



চিত্র-১.৩৪ থাই পাঙ্গাস

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: থাই পাংগাস সর্বভূক প্রজাতির মাছ। সাধারণত ক্রাস্টাশিয়ান, বিভিন্ন প্রকার মাছ, পচা শাক সবজি ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

প্রজনন: থাই পাংগাস একটি নদীর মাছ যা ৩ বৎসরে পরিপক্কতা লাভ করে। তবে চাষের পুকুরে এটি ২ বৎসরে পরিপক্ক হয়। ভালো মানের পোনা পাওয়ার জন্য ৩-৫ কেজি ওজনের ব্রুড মাছ নির্বাচন করতে হবে। পাংগাসের প্রজনন শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে।

একটি ব্রুডমাছ এক প্রজনন ঋতুতে কমপক্ষে ২ বার ব্যবহার করা যায়।

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম থাই পাংগাস মাছে ১৪.১ গ্রাম আমিষ, ১০.৮ গ্রাম চর্বি ও ১৮০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ২৫০ মি.গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ: এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ৭-৬ মাস লালন পালন করলে এ মাছ গড়ে ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের হয়। তখন বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করে বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে।

ঞ) তেলাপিয়া
স্থানীয় নাম: তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা
বৈজ্ঞানিক নাম: *Tilapia niloticus*

প্রাকৃতিক আবাস: তেলাপিয়া Cichlidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত Oreochromis গণের একটি স্বাদু পানির মাছ। মাঝারি আকারের এই মাছ বাংলাদেশের স্থানীয় নয়। এর আদি নিবাস আফ্রিকা। এই মাছ স্বল্প সময়ে অধিক বর্ধনশীল। পাশাপাশি আরও কিছু গুণাগুণের কারণে ১৯৭০ সালের দিকে এই মাছ এশিয়ার কিছু দেশে চাষের জন্য দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। ফলে ১৯৭৪ সালে UNICEF প্রথম থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এই মাছ আমদানি করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো থাইল্যান্ড থেকে এই মাছ আমদানি করে।
নাইলোটিকা খেতে খুবই সুস্বাদু এবং যেকোনো মৌসুমে চাষ করা যায়।

২০২৫

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী: তেলাপিয়া মাছ একটু চওড়া, বেটে, বলিষ্ঠ গঠনের। মাথা বেশ শক্ত ও মোটা। অনেকটা কৈ বা খলসে মাছের আকৃতির মাছ। পিঠের উপর লম্বা শক্ত কাটাযুক্ত পৃষ্ঠ পাখনা লেজের গোড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এ মাছের দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। ছোট অবস্থায় এ মাছ দেখতে কই মাছের মতো। মিঠা পানির এই মাছ সাধারণত খাল-বিলে পাওয়া গেলেও এদের ছোট পুকুর বা খামারে এককভাবে সহজে চাষ করা যায়। আমাদের দেশে তেলাপিয়া ও নাইলোটিকা উভয় মাছই তেলাপিয়া নামে বাজারে বিক্রি হতে দেখা গেলেও মাছ দুটি আলাদা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। মূলত তেলাপিয়ার এক প্রজাতি নাইল তেলাপিয়া (Nile tilapia) হচ্ছে নাইলোটিকা। নাইল তেলাপিয়া তথা নাইলোটিকার গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল। অপর দিকে তুলনামূলক চাপা বর্ণের হয়ে থাকে তেলাপিয়া। নাইলোটিকা মাছের বেশ কয়েকটি ভ্যারাইটি দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গিফট তেলাপিয়া।



চিত্র-১.৩৫ তেলাপিয়া মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: তেলাপিয়া মাছ আমিষভোজী। জলাশয়ের জুপ্লাঙ্কটনই এদের বেশি পছন্দের খাবার। বস্তুত এরা সব খাবারই খায়, পঁচাগলা প্রাণীদেহ থেকে শুরু করে নানা রকম নোংরা খাবার। সেই কারণে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাবার বাড়াবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য পরিপূরক খাবারও পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। এই খাবার আমিষসমৃদ্ধ হতে হবে। তাই পরিপূরক খাবারে খৈল, কমদামী মাছের গুঁড়ো, ডাল জাতীয় উপাদান মিশ্রিত থাকে। খামারের নানা বর্জ্য পদার্থ যেমন- গৃহপালিত পশু-পাখির বিষ্ঠা, পরিত্যক্ত দানা, হাঁস-মুরগির নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি তেলাপিয়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন: তেলাপিয়া মাছ অতি প্রজননক্ষম পুকুরে ছাড়ার তিন-চার মাসের ভিতর প্রজননে সক্ষম হয়ে উঠে এবং বছরে অন্তত তিন-চারবার ডিম পাড়ে। ঘন ঘন বাচ্চা উৎপাদন করে বলেই তেলাপিয়া মাছকে Prolific Breeder বলে। এরা পুকুরের কিনারায় বা তলদেশে গর্ত করে ডিম ছাড়ার জন্য বাসা তৈরি করে।

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম তেলাপিয়া মাছে ১৫.৫ গ্রাম আমিষ, ১.৬ গ্রাম চর্বি ও ৩৩৫ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ৩৮২ মি.গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ: এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। পাঁচ-ছয় মাস লালন পালন করলে এ মাছ গড়ে ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের হয়। তখন বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করা খুব কঠিন। পুকুরে

২০২৫

এরা প্রজনন বাসা তৈরি করে বলে খুব সহজেই জাল থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে, ফলে মাছ ধরা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণরূপে মাছ ধরার জন্য পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার এলাকার আশেপাশে যে সমস্ত জলাশয় রয়েছে সেগুলোর যে কোনো একটি পরিদর্শন কর। পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
জলাশয়ের ধরণ	
জলাশয়ের মালিকানা	
জলাশয়ের অবস্থান	
চাষকৃত মাছের নামসমূহ	১. ২. ৩. ৪.
জলাশয়ের ভৌত অবস্থা	১. ২. ৩.
জলাশয়ের কর্মরত কর্মীরা যে সকল ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর	
পরিদর্শনকৃত জলাশয়ের বর্তমান মাছচাষের সক্ষমতা বিষয়ে ১০টি বাক্যে বর্ণনা কর	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ-১

বাংলাদেশের বিভিন্ন অভ্যান্তরীণ জলাশয় সমূহের নাম ও পরিমান (শতাংশ/হেক্টর) লেখ।

ক্রম.	কাজের নাম	নাম	পরিমান (শতাংশ/হেক্টর)
০১	অভ্যান্তরীণ মুক্ত জলাশয়		
০২	অভ্যান্তরীণ বদ্ধ জলাশয়		

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ- ২

মাছের বাহ্যিক ও অভ্যান্তরীন অংগসমূহের নাম ও তার কার্যাবলী লেখ।

ক্রম.	কাজের নাম	নাম	কার্যাবলী
০১	মছের বাহ্যিক অংগসমূহ		
০২	মাছের অভ্যান্তরীন অংগসমূহ		

জব ১: মাছের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের মাছ সংগ্রহ করা
- যথাযথ ভাবে মাছের বাহ্যিক অংগসমূহ সনাক্ত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপ মতো	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	কাঁচের স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	২টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	রুই মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০২	কাতলা মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৩	মৃগেল মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৪	সিলভার কার্প	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৫	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৬	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৭	সাবান/হ্যান্ড ওয়াস	দেশি	১টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার হতে ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের তাজা বা সদ্যধৃত রুই বা কাতলা মাছ সংগ্রহ কর।

২. মাছের বাহ্যিক অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ কর এবং শনাক্ত কর।

৩. পর্যবেক্ষণের সময় আঁতশ কাচ ও নিডল ব্যবহার করে আঁইশ, পার্শ্বরেখা, নাসারন্ধ্র ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কর। ব্যাবহারিক খাতায় মাছের ছবি এঁকে বাহ্যিক অঙ্গপ্রতঙ্গ সমূহ চিহ্নিত কর।

৪. অনুশীলনের পর মাছকে স্পেসিমেন জারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ কর।

কাজের সতর্কতা:

- পচা মাছ এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কার্যকর নয়
- মানসম্পন্ন ডিসেক্টিং বক্স না থাকলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

আত্মপ্রতিফলন

মাছের বাহ্যিক অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/ আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের মাছ সংগ্রহ করা
- যথাযথ নিয়মে মাছ ব্যবচ্ছেদ করা
- সঠিক ভাবে অভ্যন্তরীণ অংগসমূহ চিহ্নিত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপ মত	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	২টি
০৪	বড় সাইজের সার্জিক্যাল কাঁচি	৮-১০ ইঞ্চি আকারের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	রুই মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০২	কাতলা মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৩	মৃগেল মাছ	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৪	সিলভার কার্প	০.৫-১.০ কেজি ওজনের	১টি
০৫	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৬	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৭	সাবান/হ্যান্ড ওয়াস	দেশি	১টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার হতে আনুমানিক আধা কেজি ওজনের রুই জাতীয় মাছ সংগ্রহ কর।

২. ব্যবচ্ছেদ ট্রের উপর মাছকে পেটের অংশ উপরের দিকে এবং পিঠের অংশ নিচের দিকে দিয়ে শায়িত কর।

৩. এবার ধারালো কাঁচির সাহায্যে পায়ু পথের সামনে থেকে চোয়াল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ কর ।

৪. যথাযথ ব্যবচ্ছেদের পর উন্মুক্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত কর।

৫. অনুশীলনকৃত নমুনাটি (মাছ) স্পেসিমেন জারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ কর।

৬. অনুশীলনকৃত কার্য পদ্ধতি ছবিসহ ব্যাবহারিক খাতায় লেখ এবং কাজ শেষে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে ল্যাবে জমা দাও।

কাজের সতর্কতা:

- একটু বড় আকৃতির মাছ ব্যবহার করতে হবে
- মাছ কাটার সময় যেন রক্ত ছিটিয়ে আশেপাশে না পড়ে সেইদিকে খেয়াল রাখতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/ আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. কোন কোন মাছে ভিটামিন এ পাওয়া যায় ?
২. কোন মাছ খেলে আয়োডিনের অভাব দূর হয় ?
৩. আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদের ওপর সার্বক্ষণিক নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কত ?
৪. স্বাদু পানিতে কত প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় ?
৫. মাছের দেহকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
৬. সিলভার কার্প মাছের আদি নিবাস কোন দেশ ?
৭. দুটি ইন্ডিয়ান মেজর কার্প (Indian major carp) মাছের নাম লেখ।
৮. একটি উদ্ভিদভোজী মাছের উদাহরণ দাও।
৯. কাতলা মাছ কোন স্তরের মাছ?
১০. মাছ কী?
১১. IPM কী?
১২. বাওড় কী?
১৩. মাংস্যসম্পদ বলতে কী বোঝায়?
১৪. দ্বি-পদী নামকরণ বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী মাছের তিনটি পুষ্টিগুণ উল্লেখ কর ?
২. আমাদের জলসম্পদকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
৩. মৎস্য সম্পদ হ্রাসের চারটি মানবসৃষ্ট কারণের নাম উল্লেখ কর।
৪. মৎস্য সম্পদ হ্রাসের দুটি প্রতিকার উল্লেখ কর।
৫. সিলভার কার্প মাছকে পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপক বলা হয় কেন ?
৬. সর্বভুক মাছ কী ? উদাহরণসহ লেখ।
৭. কার্প জাতীয় মাছের বৈশিষ্ট্যাবলী লেখ।
৮. মাছের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংগসমূহের নাম ও কার্যাবলী লেখ?
৯. খাদ্য গ্রহনের উপর ভিত্তি করে মাছের শ্রেণিবিন্যাস উদাহরণসহ লেখ।
১০. জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করে মাছের শ্রেণিবিন্যাস উদাহরণসহ লেখ।
১১. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য লেখ।
১২. শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মাবলী লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
২. মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ এবং প্রতিকার সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩. গ্রাসকার্প মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস এবং আহরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৪. মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাছচাষে পুকুরের মাটি ও পানির গুনাগুণ

Soil and Water Quality in Fish Culture



পুকুরের মাটির গঠন এবং পানির গুনাগুণের উপর মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে। পুকুরের মাটি আর পানি এই দুটি মিলেই মাছের পরিবেশ। এটাকে আমরা বলি জলজ পরিবেশ, এই জলজ পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় জৈবিক, ভৌত আর রাসায়নিক এই তিন ধরনের গুনাবলী দ্বারা। এই তিন ধরনের সকল গুনাবলী আদর্শ মাত্রায় বিরাজমান থাকলে সেখানে মাছের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় চেয়ে বেশি হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মৎস্য চাষে আদর্শ পুকুরের মাটির ধরণ নির্ণয় করতে পারব
- মৎস্য চাষের পুকুরের মাটির গুনাগুণ নির্ণয় করতে পারব
- পুকুরের পানির ভৌত ও জৈবিক গুনাগুণ নির্ণয় করতে পারব
- পানির রাসায়নিক গুনাগুণ নির্ণয় করতে পারব

২.১ মাছ চাষে পুকুরের মাটি

মাছ চাষে পুকুরের পানির যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনই মাটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মাছের খাদ্যোৎপাদন, মাছের প্রজনন, বংশবিস্তার, মাছের বৃদ্ধি, স্বাদ ও গন্ধের ক্ষেত্রে মাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাছের উৎপাদনেও যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত হয় মাটির গুনাগুণের উপর। এই কারণেই মাছ চাষের পুকুর খননের পূর্বে ঐ স্থানের মাটি, মাটির উপাদান, মাটির গঠন, মাটির স্তর ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে পুকুর খনন জরুরি। সেই সাথে মাটির শ্রেনিবিন্যাস ,মাছ চাষে পুকুরের মাটির গুরুত্ব, মাছ চাষের উপযুক্ত মাটি, পুকুরের উৎপাদনশীলতায় মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুণের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা আবশ্যক।

২.১.১ মাটি:

মাটি হলো ভূপৃষ্ঠের উপরিতল যা ভেদ করে উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়। মাটি বা মৃত্তিকা হলো পৃথিবীর উপরিভাগের নরম ও দানাদার আবরণ, যা জৈব পদার্থ, খনিজ প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মিশ্রণ। অন্যভাবে বললে আমরা বলতে পারি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক ক্রিয়ার মাধ্যমে আদি শিলার পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্টের সমান্তরালে বিভিন্ন খনিজ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ যে পাতলা ভঙ্গুর আবরণের স্তর সৃষ্টি হয় এবং যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির সহায়ক, তাকে মৃত্তিকা বা মাটি বলে।

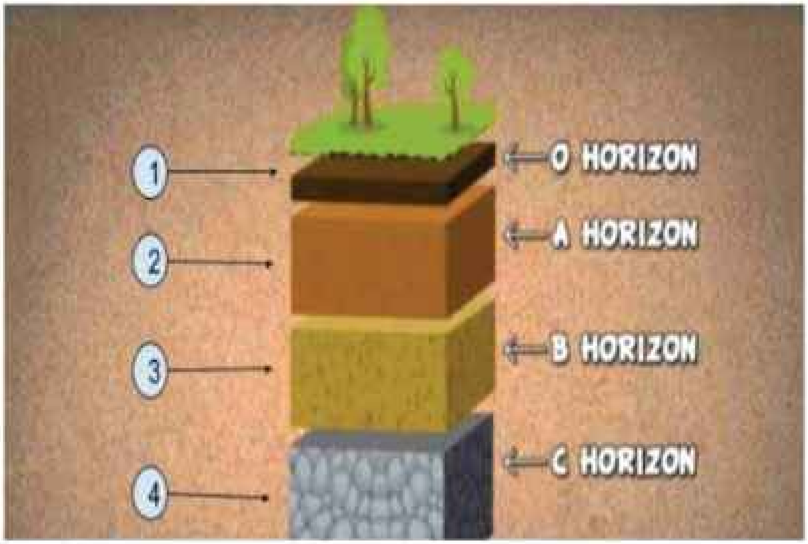


চিত্র- ২.১ মাটি

২.১.২ মাটির গঠন প্রক্রিয়া:

মাটির বর্তমান অবস্থা লাভ করতে বহু বছর সময় লেগেছে। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড রূপে পৃথিবীর সৃষ্টি। এ গ্যাসপিন্ড সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা হয় এবং এর উপরিভাগে অনেক বড় বড় শিলার উৎপত্তি হয়। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় তাপ, শৈত্য, তুষারপাত, বৃষ্টি, বন্যা, বায়ুপ্রবাহ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাগুলো ভেঙে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। আরো পরে গাছপালা ও জীবজন্তুর পচা দেহাবশেষ ক্ষুদ্র কণার সাথে মিশে মাটির উৎপত্তি হয়েছে। অতএব, মাটি হচ্ছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র শিলাকণা, জৈবকণা, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্রণ। বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন আর তার গঠনও ভিন্ন।

তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এ হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এজন্য মাটি কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখন্ড দ্বারা গঠিত।



চিত্র- ২.২ মাটির গঠন

২.১.৩ মাটি গঠনের উপাদানসমূহ:

মাটির গঠন উপাদান মূলত চারটি। এ চারটি উপাদান মাটিতে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। এর মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ বা অজৈব পদার্থ, ৫ ভাগ জৈব পদার্থ, ২৫ ভাগ পানি ও ২৫ ভাগ বায়ু। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াও মাটির অন্যতম উপাদান।

ক) খনিজ বা অজৈব পদার্থ: মাটির খনিজ পদার্থের উৎস ভূ-পৃষ্ঠের আদি শিলা। সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে আদি শিলা ক্ষয় হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। বালিকণা, কাদাকণা, পলিকণা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ। খনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি করে।

খ) জৈব পদার্থ: জৈব পদার্থ মাটির প্রাণ। মৃত গাছপালা, জীবজন্তু মাটিতে মিশে জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থ মাটিকে উর্বর করে। যে মাটিতে জৈব পদার্থের উপাদান যত বেশি সেই মাটি তত বেশি উর্বর। জৈব পদার্থ মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। জৈব পদার্থে অণুজীব ক্রিয়াশীল হয়, ফলে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়।

গ) পানি: পানি মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। পানি উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানকে দ্রবীভূত করে গ্রহণ উপযোগী করে। পানি মাটিকে রসালো রাখে। মাটিতে পানি থাকে বলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। বৃষ্টি ও সেচের পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস।

ঘ) বায়ু: বায়ু মাটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটি কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগম ও মূলের শ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন অণুজীবের বংশবিস্তারেও বায়ু দরকার হয়।



চিত্র- ২.৩ আদর্শ মাটির গঠন

২.১.৪ বাংলাদেশে মাটির শ্রেনি বিন্যাস:

মাটির বুনটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি।

ক) বেলে মাটি: এ ধরনের মাটিতে বালিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। এ মাটির কণাগুলো আকৃতিতে বড় বলে মাটিতে যথেষ্ট ফাঁক থাকে এবং অনায়াসে পানি ও বায়ু প্রবেশ করতে পারে।এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম এবং মাটির উপরের স্তর অনুর্বর। সমুদ্র উপকূল, চর এলাকা ও মরুভূমিতে এ মাটি দেখা যায়।



চিত্র- ২.৪ বেলে মাটি

খ) দো-আঁশ মাটি: এ ধরনের মাটিতে বালি, পলি ও কর্দম কণা প্রায় সমান পরিমাণে থাকে। দো-আঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি।

এ মাটির পানি শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা দুই-ই বেশি। দো-আঁশ মাটি কৃষিকাজের জন্য বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই দো-আঁশ মাটি, দো-আঁশ মাটিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন- বেলে দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ।



চিত্র-২.৫ দো-আঁশ মাটি

গ) এঁটেল মাটি: এ ধরনের মাটিতে কর্দম কণার পরিমাণ বেশি থাকে। এঁটেল মাটিকে ভারী মাটিও বলা হয়। এ মাটিতে বালিকণার চেয়ে পলিকণার পরিমাণ বেশি। পানি ধারণ ক্ষমতা বেশী কিন্তু নিষ্কাশন ক্ষমতা কম। পানির সংস্পর্শে এঁটেল মাটি নরম হয় আবার শুকালে খুবই শক্ত হয়।



চিত্র-২.৬ এঁটেল মাটি

২.১.৫ মাছ চাষে পুকুরের মাটির গুরুত্ব:

মাছ চাষে সফলতা অর্জনে মাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাটির বিভিন্ন উপাদান যেমন-পি.এইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে মাছের বর্ধন ও স্বাদ। এসব উপাদান যদি সঠিক মাত্রায় রাখা যায়, মাছের ওজন ও স্বাদ দুটিই খুব ভাল হয়। যে সকল পুকুরে কোন ধরনের অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক কেমিক্যাল ও ঔষধ ব্যবহার না করে মাটির গুনাগুণ ঠিক রাখা হয়, সে পুকুরের মাছ খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। বিভিন্ন প্রকার মাটি ও মাছ চাষে তার উপযোগীতা হলো:

(১) পলিযুক্ত দো-আঁশ মাটি মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।
(২) এটেঁল দো-আঁশ মাটি মাছ চাষের জন্য কম উপযোগী।
(৩) বেলে মাটি মাছ চাষের জন্য একদম উপযোগী নয়।
(৪) লাল মাটি মাছ চাষে খুবই ব্যয় বহুল।

২.১.৬ পুকুরের উৎপাদনশীলতায় মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুণের প্রভাব:

যে কোনও জলাশয়ের মাছের উৎপাদন সেই জলাশয়ের তলদেশের মাটির চরিত্র ও তার উর্বরতার উপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল। পুকুরের তলার মাটিকে পুষ্টি উপাদানের সঞ্চিত ভান্ডার বলা হয়। মাছ তাদের খাদ্যের জন্য প্রাথমিক ভাবে জলাশয়ের উদ্ভিদকণার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আবার এই উদ্ভিদকণাগুলোর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার নির্ভর করে জলাশয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদির উপর। এক কথায় পুকুরের তলদেশের মাটিকে পুকুরের রান্নাঘর বলা হয়। পুকুরের তলদেশের মাটির চরিত্র আমরা সাধারণ কৃষিক্ষেত্রে যে রকম মাটি দেখি তার চাইতে অনেকটাই আলাদা। এর মূল কারণ হচ্ছে এই ধরনের মাটির উপর সর্বদা পানি দাঁড়িয়ে থাকে যা কৃষিক্ষেত্রের মাটির উপর থাকে না। যে সকল গুনাগুণের উপর পুকুরের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে তা হলো:

ক) মাটির পিএইচ :

পানির পিএইচ এর মতো সাধারণত মাটির পিএইচও মাছ চাষে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পুকুরের তলদেশের মাটির জৈবিক পদার্থের বিয়োজন ক্রিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। তাই পুকুরের তলাকার মাটির পিএইচ

পানির পিএইচ অপেক্ষা কম হয়। মাছ চাষের জন্য মাটির উপযুক্ত পিএইচ হলো ৬.৫-৭.৫ এবং এই পিএইচ মানে মাটিতে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলো ভালো ভাবে মুক্ত হতে পারে।

খ) ফসফরাস :

পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস জাতীয় সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যদিও ফসফরাস সরাসরি মাছের খাবার নয়, শুধুমাত্র জলাশয়ের মাছের প্রাথমিক খাদ্য অনুবীক্ষণীক উদ্ভিদকণাগুলোর বংশ বিস্তারে সাহায্যে করে। ভালো মাছ চাযের জন্য পুকুরের তলদেশের মাটিতে সামান্য মাত্রায় ফসফরাসথাকা দরকার। মাটিতে ফসফরাস আবদ্ধ থাকলে তা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের জন্য ব্যবহার হতে পারে না। একে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারলে পুকুরের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ৬ মিলিগ্রাম ব্যবহারযোগ্য ফসফরাস থাকলে মাছের উৎপাদন ভালো হয়। তাই ভালো উৎপাদন পেতে হলে মাছ চাষে ফসফরাস জাতীয় সার প্রয়োগ করতে হয়।

গ) নাইট্রোজেন :

প্রোটিন জাতীয় পদার্থের গঠনের জন্য নাইট্রোজেন একান্ত দরকার। বায়ুমণ্ডলে ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু মাছ এই নাইট্রোজেন সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে নিতে পারে না। পুকুরের খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে জলজ উদ্ভিদ ও মাছসহ অন্যান্য প্রাণী এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। পুকুরে নাইট্রোজেন যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে আসে তা হলো-

১. নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে পুকুরের নীলাভ সবুজ শৈবাল ও বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মাটিতে আবদ্ধ করে।

২. বৃষ্টির পানির সঙ্গে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন পুকুরে আসে।

৩. বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন জাতীয় সার পুকুরে প্রয়োগের ফলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে।

ঘ) পটাসিয়াম :

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। পুকুরের মাটিতেই প্রয়োজন মতো পটাশিয়াম পাওয়া যায়। একমাত্র খুব অম্লীয় মাটির পুকুর এবং বালিযুক্ত মাটিতে পটাশিয়াম কম থাকে। সাধারণত পুকুরে কোনো পটাশিয়াম বা পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

ঙ) ক্যালসিয়াম :

মাটিতে ক্যালসিয়াম সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট রূপে থাকে। এরা পুকুরের বাফার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে পুকুরের দিবারাত্র পি.এইচ এর ওঠা-নামাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্যালসিয়াম মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পুকুরের পানিতে ক্যালসিয়াম উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত চুন প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

চ) অন্যান্য উপাদান :

অন্যান্য যে সব প্রয়োজনীয় উপাদান পুকুরের মাটিতে থাকে তাদের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ও সালফার উল্লেখযোগ্য। পুকুরের মাটিতে যদি জৈব অঙ্গারের ভাগ শতকরা ১.৫ এর বেশী হয় তবে পুকুরের উর্বরাশক্তি ভালো থাকে।

২.১.৭ পুকুর খননের সময় মাটির গঠন ও উর্বরতা পরীক্ষা:

মাছ চাষ করে ভাল উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য উপযুক্ত মাটিতে পুকুর খনন করা বা পুকুর খননের জন্য উপযুক্ত মাটি নির্ধারণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি ধাপ। মাটির উর্বরতা ও পানি ধারন ক্ষমতার উপর পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা, প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা ও মাছের খাদ্যে প্রয়োগের পরিমান নির্ভর করে বলে প্রত্যেক মৎস্য চাষির অবশ্যই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। নিচে পুকুর খনের উপযুক্ত মাটি কি কি উপায়ে আমরা পরীক্ষা করতে পারি তা দেওয়া হলো-

ক) মাটির গঠন পরীক্ষা: এ পরীক্ষার মুল উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত এলাকায় মাটির ধরণ এবং পানি ধারণক্ষমতা জানা। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন-

১. কাচের গ্লাস পরীক্ষা : যে স্থানে পুকুর কাটা হবে ঐ স্থানে ৪-৫টি জায়গা থেকে অল্প কিছু পরিমাণ মাটি তুলে একটি কাচের গ্লাসে পানির সাথে উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হয়। অতপর গ্লাসটিকে একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে হবে। কিছু সময় পরে গ্লাসের তলদেশের বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট মাটির উপাদান জমা হবে। জমাকৃত বালি কণার পরিমাণ, পলি কণার পরিমাণ ও এঁটেল কণার পরিমাণ দেখে মাটির গঠণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় এবং স্থানটি পুকুর কাটার উপযুক্ত কিনা তা নির্ণয় করা যায়।



চিত্র- ২.৭ গ্লাসের সাহায্যে মাটির গঠন পরীক্ষা

২. মাটি স্পর্শ পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ মাটি হাতের আঙুলের মাথায় নিয়ে ঘর্ষণ দিলে যদি পিচ্ছিল ও মসৃণ মনে হয় তবে বুঝতে হবে এ মাটিতে প্রচুর পরিমাণ কর্দম কণা রয়েছে। যা পানি ধারণ করে রাখতে সক্ষম। যদি খসখসে মনে হয় তবে বুঝতে হবে এ মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বালি রয়েছে এবং এ মাটির পানি ধারণক্ষমতা নেই বললেই চলে।



চিত্র-২.৮ স্পর্শ পদ্ধতিতে মাটির গঠন পরীক্ষা

৩. হাতের তালু বা মুঠ পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে মাটির পানি ধারণক্ষমতা পরীক্ষার জন্য হাতের তালুতে কিছু পরিমাণ ভেজা মাটি নিয়ে শক্ত করে হাত মুঠ করতে হবে এবং পরে খুলে ফেলতে হবে। হাতের মুঠোর মাটি যদি দলা বেঁধে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এ মাটি মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত। কারণ এঁটেল মাটি দলা বাঁধতে পারে। অপর দিকে মাটি যদি দলা না বাঁধে তাহলে বুঝতে হবে মাটিতে বালির ভাগ বেশি, যা মাছ চাষের জন্য অনুপোযোগী।



চিত্র-২.৯ মুঠ পদ্ধতিতে মাটির গঠন পরীক্ষা

৪. মাটির বল তৈরি পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে একটি বল তৈরি করতে হবে। এবারে বলটিকে উপরের দিকে (১ থেকে ১.৫ মিটার) ছুড়ে দিয়ে হাতের তালুতেই আবার ধরতে হবে। মাটির বলটি যদি ভেঙ্গে না যায় এবং পূর্বের আকারেই থাকে তবে বুঝতে হবে মাটি এঁটেল প্রকৃতির। আর যদি বলটি ভেঙ্গে যায় তবে বুঝতে হবে মাটিতে বালির ভাগ বেশি ।



চিত্র-২.১০ বল তৈরী পদ্ধতিতে মাটির গঠন পরীক্ষা

৫. কূপ খনন পদ্ধতি: অনেক সময় পুকুর খননের জন্য নির্ধারিত স্থানের উপরের মাটির স্তর এঁটেল থাকা সত্ত্বেও তলদেশের মাটি বেলে হতে পারে। এ কারণেই পুকুর কাটার পূর্বে যে স্থানে পুকুর কাটা হবে সেখানকার ৫/৬ স্থানে প্রয়োজনীয় গভীরতায় কুয়া কাটতে হয়। এবার কুয়াগুলিকে পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। কুয়ার পানি যদি কয়েক ঘন্টায় মধ্যে বা দুই এক দিনের মধ্যেই কমে যায়, তবে বুঝতে হবে পুকুরের তলদেশের মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম এবং ৭/৮ দিনেও যদি পানি না কমে তাহলে বুঝতে হবে মাটির ধারণক্ষমতা ভাল এবং মাছ চাষের জন্য উক্ত স্থানে পুকুর খনন করা যেতে পারে।

২.২ মাছ চাষে পানির গুনাগুণ

জলাশয়ের পানিতেই মাছের বসবাস, তাই মাছ চাষে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানিই মাছের আশ্রয়স্থল। পানিতেই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন ও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জৈব পদার্থ এই পানিতেই ভেঙ্গেচুরে মাছের খাদ্যের উপযোগী হয় এবং মাছ বৃদ্ধি পায় ও বংশ বিস্তার করে। সুতরাং মাছের স্বাস্থ্য, তাদের বৃদ্ধি, বংশবিস্তার, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাদ ও গন্ধ এবং সর্বোপরি মাছের উৎপাদন সহ অনান্য সবই জলাশয়ের পানির উপরে নির্ভরশীল। তাই মাছ চাষে পানির গুনাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম। জলাশয়ের পানির গুনাগুণকে আমরা ৩ ভাগে ভাগ করতে পারি।

২.২.১ ভৌত গুণ:

পুকুরের পানির ভৌত গুনাগুণ বলতে আমরা বুঝি পুকুরের পানিতে দিনের কতো ঘন্টা আলো পড়ে, পানির তাপমাত্রা কেমন থাকে, পুকুরের পানির গভিরতা কেমন ইত্যাদি। মাছ চাষে জলাশয়ের পানির ভৌত গুনাগুণকে আমরা ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যথা-

২০২৫

(১) **পানির বর্ণ:** পানির নিজস্ব কোন বর্ণ বা রঙ নেই। পানিতে যখন যে পদার্থের পরিমান বেশি থাকে



চিত্র- ২.১১ হালকা সবুজাভ মাঝারী প্ল্যাংকটনযুক্ত পানি

তখন পানি সে রঙ ধারণ করে। যেমন- পানিতে সবুজ কণিকা বা ফাইটোপ্ল্যাংকটন বেশি থাকলে উদ্ভিদ ফাইটোপ্ল্যাংকটনের বর্ণ সবুজ বিধায় পানি সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

পানি যদি খুব বেশি স্বচ্ছ হয় তাহলে সে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাবার নেই বলেই ধরে নিতে হবে। আবার পানি যদি খুব বেশি সবুজ হয় তাহলেও সে পানিতে অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটন বিদ্যমান থাকে বিধায় ইহাও মাছচাষের জন্য বেশি উপযোগী নয় বলে বুঝতে হবে। মাছচাষের জন্য উপযোগী পানির বর্ণ হলো হালকা সবুজ অথবা বাদামী।

(২) **পুকুরের পানির গভীরতা:** বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পানির বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে। আবার এদের জীবনচক্রের বিভিন্ন সময়ে/অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পানির স্তরের প্রয়োজন হয়। মাছের প্রজনন ক্রিয়া, মাছের ডিম, ডিম থেকে ডিম পোনা, ধানিপোনা, আঙুলেপোনা বা পূর্ণাঙ্গ মাছের প্রয়োজন বা পছন্দ পানির ভিন্ন ভিন্ন গভীরতা। আমরা যে ধরনের মাছই চাষ করে থাকি না কেনোতাদের জন্য সাধারণ ভাবে পানির গভীরতা ১.৫ থকে ২.০ মিটার হওয়া প্রয়োজন। পানির গভীরতা বেশি হলে পানির নীচে অবধি সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না। ফলে পানির নীচের স্তরের উদ্ভিদকণার বংশবিস্তার ও বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ফলে মাছের খাবার তৈরি হওয়া এবং এর বৃদ্ধি হওয়া কমে যায়। আবার পানির গভীরতা কম হলে পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, মাছের অস্বস্তি বাড়ে, এমন কি মাছের মৃত্যুও ঘটতে পারে। আবার পানির গভীরতা কম হলে জলাশয়ের মোট আয়তনও কমে যায় এবং মাছের খাবার দাবার সংগ্রহ করা ও চলাফেরায় যথেষ্ট অসুবিধা হয়। তাছাড়া পানির গভীরতা কম থাকলে পানির উষ্ণতা সহজেই বেড়ে যায়।

(৩) **পানির তাপমাত্রা:** জলবায়ু, সূর্যের তাপ ও জলাশয়ের গভীরতার উপর সাধারণত পানির তাপমাত্রা নির্ভর করে। পুকুরের উৎপাদনশীলতা ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার পার্থক্য ও সূর্যের তাপের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। পুকুরের পানির তাপমাত্রা সকালে কম থাকে এবং বিকালে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছে অর্থাৎ তাপমাত্রার সকাল-বিকাল পার্থক্য হয়ে থাকে। সকল বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম এবং মাছের জীবন পরিচালনা যেমন- খাদ্য গ্রহণ, প্রজনন, বৃদ্ধি, চলাফেরা, বিচরণ সবকিছু তাপমাত্রা দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়। মাছ

শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী বিধায় তাদের শরীরের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। মাছ চাষের পুকুরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর তাপমাত্রা প্রভাব বিস্তার করে।

i) মাছের বৃদ্ধি: উষ্ণ পানির মাছের বৃদ্ধি সাধারণত ২৫-৩২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল হয়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের পুকুরে প্রায় সারা বছর ধরেই এরূপ তাপমাত্রা থাকে। তবে শীতকালে অল্প সময়ের জন্য উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে তাপমাত্রা কমে যায়। একারনে সেসময় খাদ্য ও সার প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দিতে হয় অথবা বন্ধ রাখতে হয়। তাপমাত্রার প্রভাবে এক প্রজাতির মাছের চেয়ে অন্য প্রজাতির মাছের বৃদ্ধির হারের পার্থক্য হয়ে থাকে। মেজর কার্প জাতীয় মাছ ১৮ -৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মধ্যম হারে বৃদ্ধি পায় । ৫ - ১৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাছ খুবই অল্প হারে এবং তার নিম্ন তাপমাত্রায় মাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সর্বানুকূল তাপমাত্রার কম বা বেশি তাপমাত্রায় মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।



চিত্র-২.১২ পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপ

ii) মাছের জৈবিক ও রাসায়নিক কার্যাবলী : তাপমাত্রার দ্বারা জলাশয়ে মাছের জৈবিক ও রাসায়নিক কার্যাবলী প্রভাবিত হয়। সাধারণত প্রতি ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পুকুরে জৈবিক ও রাসায়নিক কার্যাবলীর মাত্রা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০° সেন্টিগ্রেড হলে পুকুরে জলজ প্রাণিকূলের অক্সিজেন ব্যবহার দ্বিগুন বৃদ্ধি পায় এবং পুকুরে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। এজন্য ঠান্ডা পানির পুকুরের চেয়ে উষ্ণ পানির পুকুরে মাছের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বেশি হয়।

iii) মাছের প্রজনন : মাছের প্রজনন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ *Tilapia mossambica* গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের মাছ। এ মাছের প্রজননের অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২১-২৩° সেন্টিগ্রেড। অনুরূপভাবে কমন কার্পের প্রজননের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ১৭-২০° সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রা অধিক কম বা বেশি হওয়ার ফলে মাছের কৃত্রিম প্রজননে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

iv) মাছের মৃত্যু : সবচেয়ে অনুকূল বা সর্বানুকূল তাপমাত্রার কম বা বেশি তাপমাত্রা হলে মাছের বৃদ্ধি হয় না। এমনকি তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে মাছ মারা যায়। শীত প্রধান দেশে মাছ বরফের নিচে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু ঐ প্রজাতির মাছ গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের পানিতে বাঁচতে পারে না। তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন হলে মাছ তা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে মাছ নিয়ে হঠাৎ করে

২০২৫

নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম তাপমাত্রার পানিতে মজুদ করা উচিৎ না। পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলে সেই পানিতে হঠাৎ মাছ মজুদ করলে মাছ অস্বস্তিকর অবস্থায় পতিত হয় বা মারা যায়।

v) পুকুরে রাসায়নিক পদার্থের কার্যকারিতা : পুকুরে যে কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতাও তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়। উষ্ণ পানিতে রাসায়নিক সার তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হয়, যেমন- ইউরিয়া সার পানিতে দিলে ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪/৫ দিনে আমোনিয়াম কার্বনেট পরিনত হয় কিন্তু ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তা ২/৩ দিনে সম্পন্ন হয়। সবুজ নরম উদ্ভিদ নাশক ঔষধ উষ্ণ পানিতে দ্রুত কাজ করে, রোটেনন উষ্ণ পানিতে ভাল কাজ করে ও দ্রুত বিষক্রিয়া লোপ পায় এবং জৈব পদার্থের পঁচনে অক্সিজেন গ্রহনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

vi) সালোক-সংশ্লেষণ: ফাইটোপ্ল্যাংকটন কর্তৃক সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি অক্সিজেনই পুকুরে অক্সিজেনের প্রধান উৎস। সূর্যের আলো অর্থাৎ তাপ যতদূর পর্যন্ত পুকুরে প্রবেশ করতে পারে ততদূর পর্যন্ত এলাকায় সালোক-সংশ্লেষণ ঘটে থাকে। কারণ সূর্যের আলো বা তাপ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। পুকুরের পানির ঘোলাত্বের পরিমানের উপর নির্ভর করে পুকুরে সূর্যের আলো সাধারণত ৩০ সে.মি. থেকে ৮০ সে.মি. পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। ফলে পুকুরের পানির মাত্র ৭০ সে.মি. থেকে ১ মিটার পর্যন্ত গভীর এলাকায় সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন যুক্ত হয়। সর্বানুকূল তাপমাত্রার কম বা বেশি তাপমাত্রা হলে সালোক-সংশ্লেষণের হার কমে যায় ।

vii) অক্সিজেনের দ্রাব্যতা ও পরিমাণ: বায়ু মন্ডলে ২১% অক্সিজেন থাকে অপর দিকে পানিতে থাকে ৫-১৪ মিলি গ্রাম/লিটার। ফলে ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় এবং পানির উপরিভাগে বাতাস প্রবাহের ফলে পানিতে স্বল্প পরিমানে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। এ ছাড়া বায়ু মন্ডলের চাপ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার উপর পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার হার নির্ভর করে। পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান হ্রাস বা বৃদ্ধি সরাসরি তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ:

পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে মাছের সহ্য সীমার মধ্যে রাখা একান্ত আবশ্যক, যে উপায়ে পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব তা নিচে দেওয়া হলো-

১. পুকুরের পানি আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
২. পুকুরের পাড়ে গাছ লাগিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. গ্রীষ্মকালে কৃত্রিমভাবে সেড তৈরী করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৪. এয়ারেটর চালনা করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৫. পুকুরের গভীরতা পর্যাপ্ত পরিমানে বাড়িয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৪) আলো:

পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলজ পরিবেশে বিদ্যমান সবুজ উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এ জন্য সমগ্র পুকুরের কমপক্ষে ৫০% জায়গায় দৈনিক অন্তত ৮ ঘণ্টা সূর্যের আলো পড়া প্রয়োজন। সূর্যালোকের অভাবে সালোক-সংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য বা প্ল্যাংকটন তৈরি হবে না।

সূর্যের আলোর সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি হয় ও উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন পানির সাথে দ্রবীভূত হয় যা মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পুকুরের চারপাশে, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে পানির ৫/৬ ফুট দূরত্বের মধ্যে ৫/৬ ফুটের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন গাছ বা ছায়া সৃষ্টি করে এমন কোনও রকম ঘরবাড়ি যেন না থাকে। পুকুর পাড়ে নানা রকম গাছপালা লাগানো বা চাষের প্রচলন ও প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা বিবেচনা করে লাগাতে হবে। বিশেষ করে পুকুরের বাঁধ রক্ষার জন্য ঘাস বা পানিতে ছায়া না পড়ে এমন ছোট ছোট সবজি চাষ বা ছোট ছোট গাছ লাগালে ক্ষতি নেই। তবে উত্তর ও পশ্চিম দিকের পূর্ণ বয়স্ক নারিকেল বা তাল গাছ তেমন ক্ষতি করে না।

(৫) পানির স্বচ্ছতা:

মাছের বসবাস, জীবনধারণ ও বৃদ্ধির জন্য পানি স্বচ্ছ বা ঘোলাত্ব মুক্ত হওয়া দরকার। পানি স্বচ্ছ না হলে সূর্যালোক থাকলেও আলো পানির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। সূক্ষ মাটিকণা পানিতে অধিক থাকার কারণে পানি অস্বচ্ছ হলে পানিতে প্রদত্ত সার যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফেট ইত্যাদির কার্যকারীতা কম হয় এবং পানির উর্বরতা হ্রাস করে। এ ছাড়া মাছের শ্বাসপ্রশ্বাসেও ব্যাঘাত ঘটে।

পানিতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদকণা (ফাইটোপ্ল্যাংকটন) বা প্রাণীকণা (জুপ্ল্যাংকটন) জন্মালে পানির স্বচ্ছতা কমে যায়। মাছের এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষতিকারক। এগুলি বেশি হলে পানিতে আলো ভেদ করতে বাধা পায়। মৃত্যুর পরেও এদের দেহাবশেষ পানিকে আরও ঘোলা করে। এদের আধিক্যে ভোরের দিকে মেঘলা দিনে অক্সিজেনের অভাবে মাছ শ্বাসকষ্টে ভোগে। সূর্যালোকের ২/৩ ঘন্টা পরে এই ঘাটতি কমে। আমরা পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করার জন্য সেকিডিস্ক ব্যবহার করতে পারি। পানির স্বচ্ছতা ৩০-৪০ সেন্টিমিটার হলে পুকুরের মাছ চাষ ভালো হয়।

পানিতে ভাসমান কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে থাকলে পানি অস্বচ্ছ দেখায়। আবার পানিতে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উৎপাদনের ফলেও পানির স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে। ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী কণিকাসমূহের আধিক্যের কারণেও পানি ঘোলা হতে পারে। এঁটেল ও লাল মাটির পুকুরের পানিতে অতি সুক্ষ মাটির কণা ভাসমান থাকে বলে প্রায় সময়ই এ ধরণের পুকুরের পানি ঘোলা থাকে। ঘোলা পানিতে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। ফলে সূর্যালোকের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। আবার অনেক সময় ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী কণিকাসমূহ মাছের ফুলকায় আটকে গিয়ে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে মাছ ঘোলা পানিতে বসবাস করলে ফুলকা পঁচে যেতে পারে।

ঘোলাত্ব দূরীকরণে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন অথবা জিপসাম ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অনেক সময় কচুরিপানা, খড়ের আঁটি, ডালপালা প্রভৃতি সাময়িক সময়ের জন্য পুকুরে রেখেও ঘোলাত্ব দূর করা যেতে পারে। এছাড়া নিয়মিত গোবর গুলিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করেও ঘোলাত্ব দূর করা যেতে পারে। একটি আদর্শ পুকুরের পানির স্বচ্ছতার সহনীয় পরিমাপ হলো ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার।

২.২.২ পানির রাসায়নিক গুনাগুণ:

মাছ জলজ প্রাণী। মাছের শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ, প্রজনন, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার সবই পানির উপর তথা পানির গুনাগুণের উপর নির্ভরশীল। পানির ভিতর নানা গ্যাস ও রাসায়নিক দ্রব্য দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু গ্যাস মাছের জীবনের পক্ষে শুধু অপরিহার্যই নয় বরং এগুলির কম বা বেশি মাছের বাঁচা-মরা ও বৃদ্ধির সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। পুকুরের পানির উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক উপাদানগুলি হলো: ২০১

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন:

পানির সকল গুনাগুণ গুলোর মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জলজ প্রাণীকুলের জন্য অত্যাবশকীয় গুনাগুণ। অধিক মাছ উৎপাদনের জন্য পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণ করা প্রায়োজন। মাছের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও পুকুরের জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD) মিটানোর জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন, ইথেন ইত্যাদির বিষাক্ততাকে প্রভাবিত করে। যখন পুকুরে পানির অক্সিজেন মাত্রা সম্পৃক্তি সীমায় (Saturation Level) বা অল্প অতি সম্পৃক্তি সীমায় (Super Saturation Level) রাখা যায় তখন মাছের বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। এছাড়া খাদ্য পরিবর্তনের হার (FCR) কমে যায় এবং সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে পানিতে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস, জৈবিক ক্রিয়া ও খাদ্য গ্রহনের হার কমে যায় ফলে মাছের বৃদ্ধির হার ও মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। মাছ সহজেই পরজীবি দ্বারা ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা সম্পৃক্তি সীমায় (Saturation Level) রাখতে পারলে মাছের জৈবিক ও বিপাকীয় কার্য বৃদ্ধি পায় তখন উচ্চ হারে উৎপাদন পাওয়া যায় ।

পুকুরে অক্সিজেনের উৎস (Oxygen Sources):

ফাইটোপ্ল্যাংকটন সালোক-সংশ্লেষনের মাধ্যমে ও বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার ফলে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধি পায়।

(১) সালোক-সংশ্লেষন (Photosynthesis):

ফাইটোপ্ল্যাংকটন কর্তৃক সালোক-সংশ্লেষনের মাধ্যমে পুকুরে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সূর্যালোক যতদূর পর্যন্ত পুকুরে প্রবেশ করতে পারে ততদূর পর্যন্ত এলাকায় সালোক-সংশ্লেষন ঘটে থাকে। কারণ সূর্যালোক সালোক-সংশ্লেষন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। সালোক-সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেনই হলো পুকুরের প্রধান উৎস।

সালোক-সংশ্লেষন বিক্রিয়া:

সূর্যালোকের শক্তি + $6CO_2$+ $6H_2O$----------------$C_6H_{12}O_6$ + $6O_2$

(২) বাতাস থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন (Solubility):

বায়ু মন্ডলে ২১% অক্সিজেন থাকে অপর দিকে পানিতে থাকে ৫-১৪ মিলি গ্রাম/লিটার। ফলে ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় এবং পানির উপরিভাগে বাতাস প্রবাহের ফলে পানিতে স্বল্প পরিমানে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। এ ছাড়া বায়ু মন্ডলের অক্সিজেনের চাপের কারনে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। বায়ু মন্ডলের অক্সিজেনের চাপ ও পানির পৃষ্ঠের অক্সিজেনের চাপ সমান হলে আর অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে না।

প্রধানত তিনটি কারনের উপর অক্সিজেনের দ্রবীভূত হওয়ার পরিমান নির্ভর করে :

- তাপমাত্রা: তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের দ্রাব্যতার পরিমান কমে যায়। আবার গরম পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

- লবনাক্ততা: পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার হার কমে যায়।
- বায়ু মন্ডলীয় চাপ: বায়ু মন্ডলীয় চাপ কমে গেলে পানিতে অক্সিজেন দ্রাব্যতার হার হ্রাস পায়।

পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা:
সাধারণত মাছ চাষের জলাশয়ে ৫- ৮ পিপিএম অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকা দরকার। অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে ৫-৮ মিলিগ্রাম অক্সিজেন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা প্রয়োজন। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৩ পিপিএম বা তারও নীচে হলে মাছ মারা যাবে না, কিন্তু তাদের জীবন স্বাভাবিক থাকবে না। তাদের বৃদ্ধি, প্রজনন এবং বংশবিস্তার ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত হবে। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যখন ১ পিপিএম এর নীচে চলে যায় তখন মাছের মড়ক দেখা যায়। মাছ পানির উপরের স্তরে চলে আসে, খাবি খায় এবং ভাসতে থাকে।

পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণ:
পুকুরে অক্সিজেন বিভিন্ন কারণে কমে যায় এবং কমে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ ও তার প্রতিকার নিচে আলোচনা করা হলো:

(১) গরম, মেঘাচ্ছন্ন ও বাতাসহীন আবহাওয়া: এরূপ আবহাওয়া আমাদের দেশে জুন থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে। এ সময় তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস বা তার বেশি থাকে ফলে পানি উত্তপ্ত হয়। পানি গরম থাকায় তার অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের দেশের বেশির ভাগ পুকুর বা জলাশয়ে ২ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার কম পরিমাণ অক্সিজেন থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় সূর্যের আলো থাকে না বলে সালোক সংশ্লেষণ মাত্রা কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় ফলে অক্সিজেন উৎপাদনও কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাতাস না থাকায় পুকুরের পৃষ্ঠের পানির উত্তালতা কমে যায় ফলে বাতাস থেকে পানিতে অক্সিজেন দ্রাব্যতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপর দিকে গরমের সময় মাছের জৈবিক ক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া গরমের শেষের দিকে পুকুর বা জলাশয়ে মাছের পরিমাণ বেশি থাকে ।

(২) ফাইটোপ্ল্যাংকটনের হঠাৎ মৃত্যু: মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় সূর্যালোকের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পুষ্টি বা পুষ্টির স্বল্পতা অথবা ফাইটোপ্ল্যাংকটনের বয়স বৃদ্ধি পাওয়ায় ফাইটোপ্ল্যাংকটনের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে থাকে। এই মৃত ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা অ্যালজির পচনের জন্যও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বিশেষ করে রাতের বেলায় ঘন ফাইটোপ্ল্যাংকটন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। এসব কারণে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৩) পুকুর বা জলাশয়ে তাপের স্তরবিন্যাস হলে: বেশি গভীর পুকুর অর্থাৎ গভীরতা ৮ ফুট বা তার বেশি হলে ঐসব পুকুরে উপরের ৪-৬ ফুট পর্যন্ত পানি দ্রুত উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত পানিতে অক্সিজেন কম থাকে। গভীরের ঠান্ডা পানির তুলনায় উপরের স্তরের অর্থাৎ গরম পানির ঘনত্ব হালকা ও ওজনে কম হয় ফলে তা নিচের ঠান্ডা ও ভারী পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারেনা। পুকুরের তলার পানি ঠান্ডা ও ভারী বিধায় পানি স্থির থাকে। এ ছাড়া পুকুরের তলায় ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা পচনশীল জৈব পদার্থ অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় পচে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এভাবে পুকুরের গভীর অংশের পানি তাপের স্তরবিন্যাসের কারনে অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় থাকে।

এ অবস্থায় হঠাৎ মুসলধারে বৃষ্টি (২-৩ ইঞ্চি বা তার বেশি) হলে পুকুরের উপরের স্তরের পানি হঠাৎ বেশি ঠান্ডা হয়। উপরের এই ঠান্ডা পানি পুকুরের গভীর অংশে চলে যায় এবং তলদেশের অক্সিজেনবিহীন পানি উপরে উঠে আসে অথবা উপরের ও নিচের পানির মিশ্রন ঘটে। এভাবে মাছ চাষের পুকুরে হঠাৎ অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৪) জৈব পদার্থ পচনের ফলে: পুকুরে গ্রীষ্মকালে বা তার পরবর্তী সময়ে মোট মাছের পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় পুকুরে তখন বর্জ্য ও জৈব পদার্থ (যেমন- অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, মাছের মল ও অতিরিক্ত খাদ্যের অংশ) ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই বর্জ্য ও জৈব পদার্থ পচতে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। ফলে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৫) জৈব সার: পুকুরে অধিক জৈব সার, যেমন- গোবর, মুরগীর লিটার ইত্যাদি ব্যবহার করলে তাদের পচনে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। ফলে তখন মাছ চাষের পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৬) পানির সরবরাহ বন্ধ করলে: নিবিড় মাছ চাষের পুকুরে পানির প্রবাহ কমিয়ে দিলে বা বন্ধ করলে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৭) শীতকালে তাপমাত্রা কমে গেলে: শীতকালে হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে মাছ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়। ফলে প্রয়োগকৃত অতিরিক্ত খাদ্য ও পুকুরের তলার বর্জ্য পদার্থ পচনে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়।

প্রতিকারসমূহ:

১. অতিরিক্ত রাসায়নিক, জৈব সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

২. পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৩. ফাইটোপ্ল্যাংকটন ব্লুম ধ্বংসের পর পানি কালো হলে বা পরিষ্কার হয়ে গেলে পরিমানমত চুন দিয়ে পরবর্তীতে টি এস পি সার প্রয়োগ করে পানি পুনরায় পরিমিত পরিমানে সবুজ করতে হবে ।

৪. এয়ারেটর ব্যবহার করে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি করা যায়। পুকুর ৮ ফুটের বেশি গভীর হলে তাপীয় স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে এজন্য পুকুরে দুপুরের পর এয়ারেটর চালু করতে হবে।

৫. পুকুরের ২০% পরিমান পানি বের করে দিয়ে নতুন পানি প্রবেশ করালে অক্সিজেন বৃদ্ধি পায়।

৬. কৃত্রিমভাবে পাম্প মেশিন দিয়ে বা লোক পুকুরে নামিয়ে বাঁশ বা পাতিল দিয়ে পুকুরের পানি পিটিয়ে স্রোতের সৃষ্টি করলে পুকুরে অক্সিজেন বৃদ্ধি পাবে।

৭. পুকুরে যাতে অতিরিক্ত মাছ মজুদ করা না হয় সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে।

৮. পুকুরে বিশেষ করে নিবিড় বা আধানিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের পুকুরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য নিয়মিতভাবে দুপুরের পর ঠান্ডা পানি প্রবেশ করাতে হবে।

৯. সর্বোপরি ব্যবস্থাপনায় সর্বদা সর্তক থাকতে হবে যাতে পুকুর বা জলাশয়ের অক্সিজেন স্বল্পতার কারণ সৃষ্টি না হয়।



চিত্র-২.১৩ পুকুরে অক্সিজেন অভাবজনিত সমস্যা দূর করার উপায়

পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড:

পৃথিবীর সকল জীবের মূল ভিত্তি হলো কার্বন নামক মৌল। এই কার্বনের প্রধান আধার হলো কার্বন ডাই অক্সাইড। মাছ চাষের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডকে অনেকে আপদ বলে মনে করে। কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া সালোক-সংশ্লেষন হবে না। আর সালোক-সংশ্লেষন ছাড়া পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই মাছ চাষের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড পানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান। জলাশয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড আসে নিম্নের কয়েকটি উৎস থেকে:

১) বায়ুমন্ডল থেকে পুকুরের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আসে কারণ বায়ুমন্ডলে ০.০৩৩% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড অল্প পরিমাণে থাকলেও পানিতে দ্রুত দ্রবীভূত হতে পারে। অক্সিজেনের চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড পানিতে দ্রুত দ্রবীভূত হতে পারে।

২) মাছ, আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ অর্থাৎ ফাইটোপ্লাঙ্কটন ও জলাশয়ের অন্যান্য প্রাণী শ্বসনের মাধ্যমে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ে।

৩) পুকুরের তলদেশের পচনশীল জৈব পদার্থ (অতিরিক্ত খাদ্য, মৃত প্ল্যাংকটন, জৈব সার ইত্যাদি) পচনের ফলে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪) ভূগর্ভস্থ পানি পুকুরে প্রবেশ করলে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় কারন, পানিতে ০-১০০ মিলিগ্রাম/লিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে।

৫) পানিতে অবস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের বাইকার্বনেট বা কার্বনেট হতে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহ হয়।

৬) বৃষ্টির পানির কারণে পুকুরে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায় কারণ,এ পানিতে প্রায় ০.৬ মিলিগ্রাম/লিটার দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে এবং অল্প পরিমাণে দুর্বল কার্বনিক এসিড থাকে যা সহজেই ভেঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়।

প্রত্যাশিত মাত্রা :

পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ৫ মিলিগ্রাম/ লিটারের বেশি থাকা ভাল নয় কিন্তু অধিক সংখ্যক প্রজাতির মাছ ৬০ মিলিগ্রাম/লিটার মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে যদি পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ থাকে।

প্রতিকার :

১) পুকুরে এয়ারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে তাতে অতিরিক্ত মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পানি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বাফারিং এর কারণে পানির পি.এইচ স্থির থাকবে। এছাড়া পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

২) গভীর পুকুরে পানির সরবরাহ বা ঝরণার ব্যবস্থা না থাকলে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় পানিতে এয়ারেশনের ব্যবস্থা করলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্যজনিত সমস্যার সমাধান হয়।

৩) পুকুরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেলে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য খাদ্য ও সার প্রয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

সাবধানতা:

পুকুরে দুপুর বা তার পরে কার্বন ডাই-অক্সাইড কম থাকে। এ সময় পানির পিএইচ এবং তাপমাত্রা বেশি থাকে বিধায় পানিতে মুক্ত অ্যামোনিয়া বেশি থাকে। এ সময় চুন প্রয়োগ করলে অ্যামোনিয়া জনিত বিষাক্ততা বেড়ে যাবে এবং মাছ মারা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তখন অনেকেই বলে থাকে চুনের কারণেই মাছ মারা গিয়েছে। সঠিক কারণ হলো চুন প্রয়োগের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই মাছ মারা গিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। সহজ কথা হলো যেসময় পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি থাকবে কেবল সেই সময়ে পুকুরে চুন দেওয়ার পরামর্শ দিতে হবে বা চুন দিতে হবে।

মোট ক্ষারত্ব বা অ্যালকালিনিটি:

মাছ চাষে পানির ক্ষারত্ব বা অ্যালকালিনিটির একটা গুরুত্ব আছে। প্রতি লিটার পানিতে অ্যালকালিনিটির পরিমাণ ২০ মিলিগ্রাম (২০ পিপিএম) থেকে ২০০ মিলিগ্রামের (অর্থাৎ ২০০ পিপিএম) মধ্যে হওয়া দরকার। পানিতে ২০ পিপিএম এর কম ক্ষারে বা ২০০ পিপিএম-এর বেশি ক্ষারে পানিস্থ উদ্ভিদকণার সালোক-সংশ্লেষণের বাধা পাবে। তাদের বৃদ্ধি, বংশবিস্তার, কিছুই সুষ্ঠু ভাবে হবে না। মাছ চাষ লাভ জনক হবে না। উদ্ভিদকণা বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পানির অ্যালক্যালিনিটি বা ক্ষারত্ব সাধারণত পানির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মোট কার্বনেট, বাইকার্বনেট বা হাইড্রাইড-এর উপর নির্ভর করে। এগুলির বৃদ্ধিতে পানির ক্ষারত্ব বাড়ে। এগুলি মাছের খাদ্য হিসেবেও দরকারী। পুকুরে পানির অ্যালকালিনিটি কমে গেলে চুন প্রয়োগ করতে হয়।

পুকুরের পানির পিএইচ (P^H):

পানি একটি মৃদু বিদ্যুৎবাহী পদার্থ। পানির মধ্য দিয়ে মৃদু বিদ্যুৎ প্রবাহে সুবিধা হয়। এই কারণে এর কিছু অংশ বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও হাইড্রোক্সিল অ্যানায়ন (OH) তৈরি হয়ে থাকে। পানির এই হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোক্সিল অ্যানায়নের গাঢ়ত্বই হল তার ঐ সময়ের পিএইচ। কোনও পদার্থের পিএইচ

২০১৬

৭ মানে ঐ পদার্থের হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনত্ব বা গাঢ়ত্ব সমান। এই অবস্থায় পানি এসিড বা ক্ষারক নয়। যখন এই গাঢ়ত্ব ৭-এর কম হয় তখন সেই পানিকে এসিড ভাবাপন্ন এবং ৭-এর বেশি হলে তাকে ক্ষারকীয় বলে। পানির পিএইচ সাধারণত ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণি বিধায় জলজ পরিবেশের উপর মাছের জৈবিক ও শারীরবৃত্তীয় সকল কার্যক্রম নির্ভরশীল। মাছ ও জলজ জীবের উপর পানির পিএইচের প্রভাব দেয়া হলো :

পিএইচ (P^H)	ফলাফল
১) ৪.০	এসিডীয় কারণে মাছ মারা যায়।
২) ৪.০-৫.০	মাছের প্রজনন হয় না।
৩) ৫.০-৬.৫	মাছ ধীরে বৃদ্ধি পায়।
৪) ৬.৫-৯.০	মাছের ভাল ভাবে বৃদ্ধি হয়।
৫) ৯.০-১১.০	মাছের ধীরে বৃদ্ধি হয়।
৬) ৯.৫-১১.০	মাছের প্রজনন হয় না।
৭) >১১.০	ক্ষারীয় কারণে মাছের মৃত্যু হয়।

পিএইচ (P^H) নিয়ন্ত্রণ: পি.এইচ কমে গেলে বাড়ানোর জন্য যা করণীয়:

১) পানিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার চুন প্রয়োগ করে তার ২/৩ দিন পর পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। পিএইচ কাংখিত মাত্রায় না পৌছা পর্যন্ত চুন আরও প্রয়োগ করতে হবে।

২) পানিতে সার প্রয়োগ করে বা অধিক খাদ্য প্রয়োগ করে পানিতে ফাইটোপ্ল্যাংকটন তৈরি করলে পানির পিএইচ বেড়ে যাবে।

পি.এইচ বেড়ে গেলে কমানোর জন্য যা করণীয়:

১) পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে বা কয়েক দিন বন্ধ রেখে পানির পুষ্টির পরিমাণ কমিয়ে দিলে পি.এইচ কমে যাবে।

২) পুকুরে পরিষ্কার / স্বচ্ছ পানি প্রবেশ করিয়ে।

৩) পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের পরিমাণ বেশি থাকলে বা ব্লুম হলে পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় প্রতি শতাংশে ৫০০-৭৫০ গ্রাম করে পাথুরে চুন (CaO) সন্ধ্যার সময় ৩/৪ দিন পরপর ২/৩ বার প্রয়োগ করলে পুকুরের বিকালের পিএইচ ধীরে ধীরে কমে যাবে।

৪) প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি হারে জিপসাম ($CaSO_4$, $2H_2O$) অথবা প্লাস্টার অফ প্যারিস $CaSO_4$ H_2O পানিতে প্রয়োগ করলে পিএইচ কমে যাবে। তবে কাঙ্খিত মাত্রায় পিএইচ নেমে না আসা পর্যন্ত একাধিকবার প্রয়োগ করতে হবে। এই মাত্রায় জিপসাম প্রয়োগ মাছের জন্য নিরাপদ।

৫) অ্যালাম বা ফিটকারি প্রতি শতাংশে ৫০০-১০০০ গ্রাম গুড়া করে পানির সাথে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে পিএইচ কমে যাবে। পিএইচ কাংখিত মাত্রায় নেমে না আসা পর্যন্ত একাধিক বার প্রয়োগ করতে হবে। এই মাত্রায় ফিটকারি প্রয়োগ মাছের জন্য নিরাপদ।

পানির পিএইচ (P^H) কত হওয়া ভালো :

মাছ চাষের উপযোগী পিএইচ ৭-এর উপরে অর্থাৎ পুকুরের পানি একটু ক্ষার ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অতিরিক্ত ক্ষার বা অতিরিক্ত এসিড পানিতে মাছ চাষ ভালো হয় না, মাছের বংশ বিস্তার, জীবনধারণ ও বৃদ্ধি ভালো হয় না। তাই লাভজনকও নয়। পানিতে পিএইচ এর মান ১১-এর বেশি হলে মাছ মারা যেতে পারে। আবার পিএইচ-এর মান ৪-এর কম হলে মাছের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ-এর মান ৭.৪ থেকে ৮.৫-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।



চিত্র- ২.১৪ পিএইচ পরিমাপের স্ট্রিপ

মোট খরতা:

সাধারণত খরতা হল ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরিমাপক। যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। পানির খরতা ২০ মিলিগ্রাম/লিটারের কম হলে পানির বাফার ক্রিয়া (Buffer action) নষ্ট হয়ে যায় এবং মাছের জন্য তা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। ভাল জলাশয়ের খরতা ৪০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার এর মধ্যে হওয়া উচিত। পুকুরের পানিতে মোট খরতার পরিমাণ কমে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে এ মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। তবে মোট ক্ষারত্বকে অপরিবর্তিত রেখে মোট খরতা বাড়াতে চাইলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে জিপসাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

নাইট্রোজেন:

নাইট্রোজেন উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের মৌল পুষ্টি উপাদান। নাইট্রোজেন উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনকে ঘন সবুজ রাখতে সহায়তা করে। পরিমিত নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, যা মাছচাষের জন্য ভাল। পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার (মাটিতে ৮-১০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি) নাইট্রোজেন মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। প্রাকৃতিক পানিতে নাইট্রোজেন সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না বিধায় মাটিতে বা পানিতে নাইট্রোজেনের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। পানির স্বচ্ছতা ৩০ সেন্টিমিটার বা ১ ফুটের বেশি হলে সাধারণত প্রতি একর পুকুরে ২০ কেজি হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

অ্যামোনিয়া :

অ্যামোনিয়া মাছের জন্য বিষাক্ত। মাছ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে পানিতে অ্যামোনিয়া নিঃসরণ করে। এ ছাড়াও পুকুরের জৈব বস্তুর ব্যাক্টেরিয়াজনিত পঁচনের ফলেও পানিতে অ্যামোনিয়া নিঃসরণ হয়। পানিতে আমোনিয়া নিঃসরণের পরিমাণ সরাসরি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার ও খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মাছ খাদ্য হিসেবে যে প্রোটিন গ্রহণ করে, শরীরের মধ্যে তা ভেঙ্গে কিছু নাইট্রোজেন মাছের শরীরে প্রোটিন গঠন করে, কিছু মাছের শরীরে শক্তি উৎপন্ন করে এবং বাকি নাইট্রোজেন ফুলকা দিয়ে অ্যামোনিয়া আকারে বের করে দেয়।

পুকুরে অ্যামোনিয়ার অন্য উৎস হলো পুকুরের তলদেশীয় জৈব বর্জ্য পদার্থ। যা থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া নিঃসরিত হয়। পুকুরের তলদেশে মাছের জন্য প্রয়োগকৃত খাদ্য ও অ্যালজি পুকুরের তলদেশে প্রচুর জৈব পদাথের্র সৃষ্টি করে। মাছের মল এবং মৃত অ্যালজি পুকুরের তলায় জমে থাকে এবং পরবর্তীতে ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা পচে পুকুরে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

পুকুরে অ্যামোনিয়ার প্রত্যাশিত মাত্রা :

পুকুরে মাছ চাষের জন্য অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম থাকা ভালো।

পুকুরের অ্যামোনিয়ার ব্যবস্থাপনা :

১) পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রেখে অথবা পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে : পুকুরে অ্যামোনিয়ার প্রাথমিক উৎস্য হলো খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ। মাছ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করে এবং এ প্রোটিন বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে মাছের শরীরে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। শরীরে উৎপন্নকৃত অ্যামোনিয়া মাছ ফুলকা দিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয়। সুতরাং পুকুরে অ্যামোনিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খাদ্য প্রয়োগের হার ও খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অল্প কয়েক দিনের জন্য পুকুরে খাবার বন্ধ করলে অ্যামোনিয়ার পরিমান কমে যায়।

২) এয়ারেশন বৃদ্ধি করে: বিষাক্ত অ্যামোনিয়া পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস। অনেকে মনে করে এয়ারেশন দ্বারা পুকুর অ্যামোনিয়া মুক্ত করা সম্ভব। এতে পানি থেকে অ্যামোনিয়া ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বাতাসে চলে যায়।

৩) ফসফরাস সার প্রয়োগ করে: মাছ থেকে নিঃসরিত অ্যামোনিয়ার বেশির ভাগই পুকুরের অ্যালজি গ্রহণ করে। সুতরাং পুকুরে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হলে অ্যালজি তা গ্রহণ করে। অ্যামোনিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে অ্যালজি স্পঞ্জের ন্যায় কাজ করে। এজন্য প্রমাণিত হয়েছে পুকুরে ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে পুকুরে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমে যায়। কারণ ফসফরাস সার প্রয়োগে পুকুরে অ্যালজি বৃদ্ধি পায়। পুকুরে অ্যালজির ব্লুমের ঘনত্ব বেশি থাকলে তখন ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের অভাব এবং আলোর অপর্যাপ্ততার কারনে অ্যালজির বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় পুকুরে ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে পানির অ্যামোনিয়ার ঘনত্বের পরিমাণ কমাতে পারে না কারন অ্যালজি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধির সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌছে গিয়েছে।

৫) পুকুরের গভীরতা বৃদ্ধি করে: অগভীর পুকুর থেকে অপেক্ষাকৃত গভীর পুকুরে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। সুতরাং গভীর পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের কারনে অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব কম থাকে। কারন গভীর পুকুরে পানির পরিমাণ বেশি যা পুকুরের অ্যামোনিয়ার ঘনত্বকে পাতলা করে থাকে।

৬) পানি অদল-বদল করে: পুকুরের পানি অদল-বদল করে অর্থাৎ কিছু পানি বের করে পুকুরে নতুন পানি প্রবেশ করালে পুকুরের পানির অ্যামোনিয়া কমিয়ে ফেলে যায়। যদিও বাণিজ্যিক ভাবে মাছ চাষের পুকুরে প্রচুর পানি থাকে যা পাম্পের সাহায্যে বের করে নেওয়া ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ বিষয়।

৭) ব্যাক্টেরিয়া বা প্রোবায়োটিক্স সংযোজন করে: জলজ পরিবেশের সাধারণ ব্যাক্টেরিয়া পুকুরের বাস্তুসংস্থানের একটি গুপ্রত্বপূর্ণ অংশ। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে পুকুরে অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ভুল প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া বা ব্যাক্টেরিয়ার অপর্যাপ্ততা। সেই ক্ষেত্রে পুকুরের পানিতে প্রোবায়োটিক্স সংযোজন করে অ্যামোনিয়ার পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব।

৮) জৈব কার্বনের সংযোজনের মাধ্যমে: পুকুরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকলে নিবিড় মাছ চাষের পুকুরে জৈব কার্বনের উৎস হিসেবে টুকরা করা খড় পুকুরে ডুবিয়ে রাখলে পুকুরে অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S):

অবিয়োজিত হাইড্রোজেন সালফাইড মাছের জন্য খুবই বিষাক্ত। পানির তলদেশে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থের পচনের ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয়। পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ দ্বারা এ গ্যাসের উপস্থিতি অতি সহজেই বোঝা যায়। পুকুরের পানির জন্য হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হলো ০.০০৩ মিলিগ্রাম/ লিটার এর কম। কোন কারণে পুকুরে এ গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে পুকুরের তলদেশে হড়রা টেনে এ গ্যাস দূর করা যায়।

পানিতে ফসফেটের উপস্থিতি :

পুকুরের পানিতে মাছের বৃদ্ধির জন্য ফসফেটের প্রয়োজন। মাছের খাবার উদ্ভিদকণার বৃদ্ধির জন্য ফসফেট অপরিহার্য। পানির ফসফেটের উৎসগুলি হল বড় প্রাণীদের রেচন পদার্থগুলি, খাদ্যের পচা অবশিষ্ট ও প্রদত্ত সার।

২.২.৩ জৈবিক গুণ

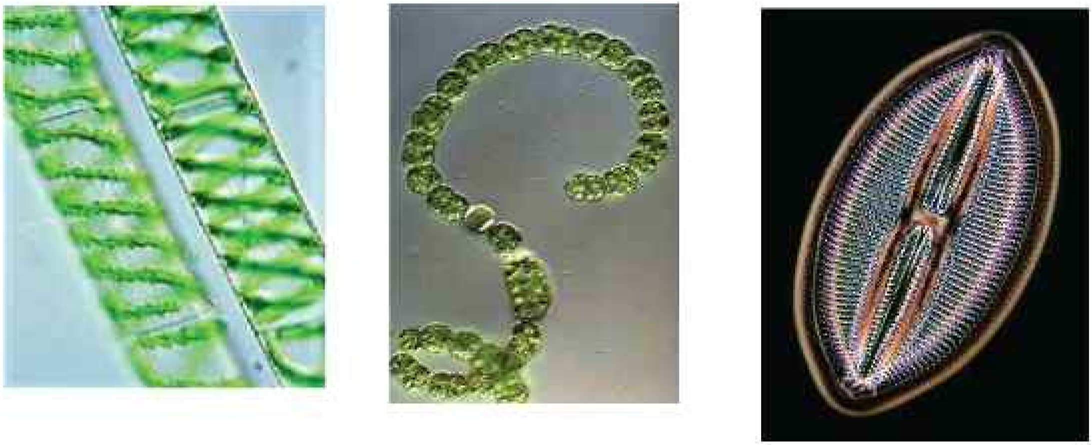
জৈব উৎপাদনের জীবকূল পুকুরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে। এসব জীবকে এদের অবস্থান অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-ভাসমান জীবকূল, তলদেশের জীবকূল এবং জলজ উদ্ভিদকূল।

ক) ভাসমান জীবকূল:

ভাসমান জীবকূলের মধ্যে প্ল্যাংকটন অন্যতম। প্ল্যাংকটন হলো এক ধরণের আণুবীক্ষণিক প্রাণী বা উদ্ভিদ জাতীয় অণুজীব। এসব অণুজীব পানিতে ভাসমান বা ঝুলন্ত অবস্থায় উপযুক্ত পরিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান থাকে এবং পানির প্রাথমিক উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিগত দিক থেকে প্ল্যাংকটনকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন/ফাইটোপ্ল্যাংকটন (Phyto Plankton)
২) প্রাণী প্ল্যাংকটন/জুপ্ল্যাংকটন (Zoo Plankton)

১. ফাইটোপ্ল্যাংকটন: এ জাতীয় প্ল্যাংকটনের উদাহরণ হলো-স্পাইরোগাইরা, অ্যানাবেনা, নেভিকুলা, ফেকাস, সিউডোমোনাস ইত্যাদি।



চিত্র- ২.১৫ ফাইটোপ্ল্যাংকটন

২) জুপ্ল্যাংকটন: এ জাতীয় প্ল্যাংকটনের উদাহরণ হলো- ড্যাফনিয়া, সাইক্লপস, রোটিফেরা, ময়না, ফিলিনিয়া ইত্যাদি।



চিত্র- ২.১৬ জুপ্ল্যাংকটন

মাছচাষে ভাসমান জীবকূলের প্রভাব:

মাছচাষে ভাসমান জীবকূল তথা প্ল্যাংকটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক চাষযোগ্য মাছ আছে যারা খাদ্য ও পুষ্টির জন্য সরাসরি উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উপর নির্ভরশীল। যেমন- সিলভার কার্প মাছ। আবার এমন কিছু মাছ আছে যারা মূলত প্রাণী প্ল্যাংকটনের উপর নির্ভরশীল। যেমন- বিগহেড, কাতলা প্রভৃতি। প্ল্যাংকটন শুধুমাত্র মাছের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এমন কিছু কিছু প্ল্যাংকটন আছে যারা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে। যেমন- ব্লু-গ্রীণ অ্যালজি। তবে পুকুরে এদের আধিক্য খুব বেশি থাকলে এক সময় সেগুলো পচে গিয়ে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই পানিতে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় সীমার মধ্যে রাখা উচিত। এর জন্য পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা দরকার। কোন ক্রমেই মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

২০২৫

খ) তলদেশের জীবকূল

পুকুরের পানির তলদেশে কাদার উপরিভাগে বা কাদার মধ্যে বসবাসকারী জীবকূলকে বেন্থোজ (Benthose) বলে। যেমন- কাইরোনোমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি এ স্তরের অন্তর্ভূক্ত প্রাণী।



চিত্র- ২.১৭ বেন্থোস

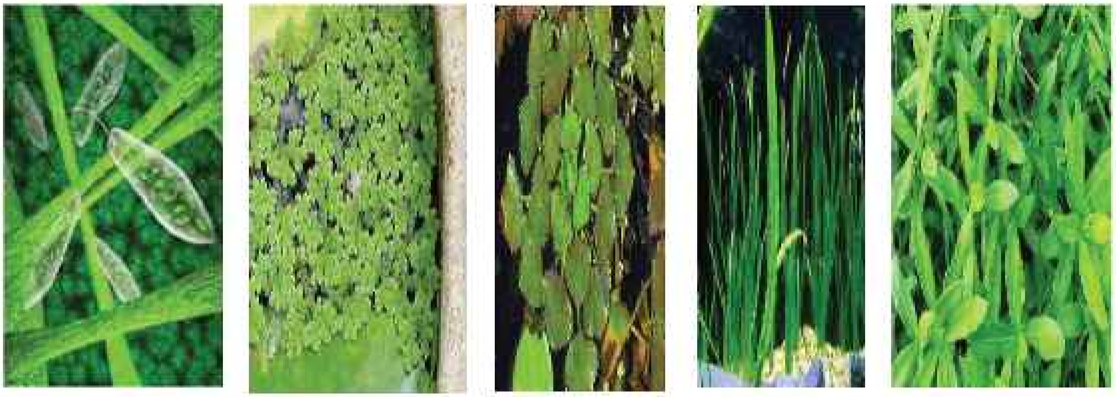
মাছ চাষে তলদেশের জীবকূলের প্রভাব:

তলদেশীয় জীবকূল বা বেন্থোজ মাছচাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- মৃগেল, কমন কার্প, মিরর কার্প, ব্ল্যাক কার্প, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ পুকুরের তলদেশের খাদ্য খেয়ে থাকে। যেসব পুকুরের গভীরতা ৬ ফুটের কম ঐ সমস্ত পুকুরে বেশি পরিমাণে বেন্থোজ জন্মায় পক্ষান্তরে ৬ ফুটের বেশি গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে এসব প্রাণী কম পরিমাণে জন্মায়। বেন্থোজ জাতীয় প্রাণী পুকুরের তলা থেকে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সহায়তা করে যা প্ল্যাংকটন উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে পুকুরে শামুক ও ঝিনুক বেশি পরিমাণে থাকলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস কমে যায় বা মাছ ও চিংড়ির হাড়, খোলস নরম হয়ে যায়, ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পুকুরে নিয়মিত জৈব সার প্রয়োগ করে তলদেশের প্রাণীর পুষ্টি ত্বরান্বিত করা যায়। পুকুর প্রস্তুতির সময় তলদেশে হালচাষ করে জৈব সার ও খৈল মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিলে বেন্থোজ জাতীয় প্রাণীকূলের উৎপাদন ভাল হয়।

গ) জলজ উদ্ভিদকূল:

পুকুরের জলজ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা থাকে। সচরাচর পুকুরে প্রাপ্ত জলজ উদ্ভিদকে নিচে বর্ণিত উপায়ে ভাগ করা যায়। যেমন-

১) শ্যাওলা জাতীয়, যথা- স্পাইরোগাইরা, ইউগ্লিনা ইত্যাদি,
২) অর্ধডুবন্ত উদ্ভিদ, যথা - শাপলা, পানিফল ইত্যাদি,
৩) ভাসমান উদ্ভিদ, যথা- কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি,
৪) নির্গমনশীল উদ্ভিদ, যথা - আড়াইল, বিষকাটালী ইত্যাদি,
৫) লতানো জলজ উদ্ভিদ, যথা - কলমিলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।



চিত্র- ২.১৮ জলজ উদ্ভিদকূল

মাছচাষে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব:

অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ মাছচাষের জন্য ক্ষতিকর। কেবলমাত্র এককোষী শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের পরিমিত পরিমাণ উপস্থিতি মাছচাষের জন্য ভাল। অন্যান্য সকল প্রকার জলজ উদ্ভিদ পানি ও মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন উৎপাদন ব্যহত হয়। অবশ্য কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদের নরম অংশ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাইড্রিলা, ভ্যালিসনেরিয়া জাতীয় উদ্ভিদ গ্রাসকার্প মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার অ্যাজোলা ও ক্ষুদিপানা সরপুঁটি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুষ্টি গ্রহণ ছাড়াও জলজ উদ্ভিদ পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা প্রদান করে ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং রাক্ষুসে প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন তথা মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অগভীর পুকুরে সূর্যালোকের হাত থেকে মাছকে রক্ষার উদ্দেশ্য অল্প সময়ের জন্য সীমিত সংখ্যক লতানো জলজ উদ্ভিদ, যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা প্রভৃতি রাখা যেতে পারে।

এক নজরে মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী মাটি ও পানির বিভিন্ন গুনাগুণের নাম, অনুকূল মাত্রা এবং সমাধানে করণীয়:

একটি জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা তার মাটি ও পানির গুনাগুণের ওপর নির্ভর করে। মাছচাষে ভাল ফল পেতে হলে পুকুরের মাটি ও পানির গুণাবলী সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। মাছ পানিতে বসবাস করে এবং পানি থেকেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আবার মাটি হচ্ছে পানি সংরক্ষণের আধার অর্থাৎ পানির খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা সরাসরি মাটির গুনাগুণের ওপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে হলে মাটি ও পানির বিভিন্ন গুনাগুণের অনুকূল মাত্রা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। নিচে মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এমন পুকুরের মাটি ও পানির গুনাগুণের নাম এবং অনুকূল মাত্রা দেয়া হলো-

গুনাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা	সমাধানে করণীয়
মাটির প্রকৃতি	দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী এর পরে এঁটেল মাটি। বেলে মাটির পুকুর মাছচাষে ততবেশী উপযোগী না।	বেলে মাটির পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার (গোবর) প্রয়োগ করে মাছচাষের উপযোগী করা যেতে পারে।

২০২৫

পাড়ের অবস্থা	মূল ভূমি হতে কমপক্ষে ২ ফুট উঁচু হতে হবে।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে মাটি কেটে পাড় উঁচু করা যেতে পারে।
পাড়ে গাছপালার অবস্থান	পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে অথবা নির্দিষ্ট ঋতুতে পাতা ঝড়ে যায় এমন কোন গাছপালা না থাকাই ভাল।	গাছপালা থাকলে অবশ্যই নিয়মিতভাবে ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
পাড়ের ঢাল এবং বকচর	এঁটেল মাটির পুকুরে ১ঃ১.৫ এবং দো-আঁশ মাটির পুকুরে ১ঃ২ ঢাল থাকতে হবে। ঢালের পরে ৫ ফুট বকচর থাকলে ভাল হয়।	নতুন পুকুর খননের ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
তলদেশে কাদার পরিমাণ	৬ ইঞ্চি এর বেশি নয়।	পুকুর পুরাতন হলে এবং তলদেশে কাদার পরিমাণ আদর্শ মানের চেয়ে বেশি হলে পুকুর শুকিয়ে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে।
পুকুরের আকার এবং আয়তন	আয়তাকার এবং তা উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বী হলে সবচেয়ে ভাল। আয়তনের ক্ষেত্রে-নার্সারি পুকুর ২০—৩০ শতাংশ এবং মজুদ পুকুর ১—২ একর।	পুকুর খননের সময় অবশ্যই এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।
তাপমাত্রা	কার্পজাতীয় মাছের জন্য ২৫-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা সবচেয়ে ভাল।	যদিও এ ব্যাপারে আমাদের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই তবুও তাপমাত্রার সাথে মাছের খাদ্যগ্রহণ তথা বৃদ্ধির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে বিধায় এ ব্যাপারেও মৎস্য চাষিকে সচেতন হতে হবে।
সূর্যালোকের উপস্থিতি	সমগ্র পুকুরের কমপক্ষে ৫০% জায়গায় দৈনিক অন্তত ৮ ঘন্টা সূর্যের আলো পড়া প্রয়োজন।	সূর্যালোক প্রবেশে বাধা প্রদানকারী গাছপালাকে অপসারন করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
পানির বর্ণ	হালকা সবুজ অথবা বাদামী সবুজ।	প্রয়োজন অনুসারে পানির বর্ণ দেখে জৈব/অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
পানির গভীরতা	নার্সারি পুকুর ৩ ফুট এবং মজুদ পুকুর ৬ ফুট।	পরিকল্পনা অনুযায়ী পুকুর খনন করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

২০১৬

দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর উপরে।	পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, নতুন পানি সংযোগ করে বা সম্ভব হলে এরেটর ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড	২ মিলিগ্রাম/লিটার মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন।	কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে সমাধানকল্পে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
পি.এইচ মান	পিএইচ মান ৭.৫ থেকে ৮.৫ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।	পানি অম্লীয় হলে প্রয়োজন অনুসারে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন এবং ক্ষারীয় হলে শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।
মোট ক্ষারত্ব	৭০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার।	উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে ক্ষারত্বের মান কমে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
মোট খরতা	৪০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার।	উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে খরতার মান কমে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
নাইট্রোজেন	পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং মাটিতে ৮–১০ মিলিগ্রাম/ ১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইউরিয়া সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
নাইট্রেট নাইট্রোজেন	পানিতে ০.১ মিলিগ্রাম/লিটার এর নিচে থাকা ভাল।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইউরিয়া সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
ফসফরাস	পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং মাটিতে ১০–১৫ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে টিএসপি সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
অবিয়োজিত অ্যামোনিয়া	০.০২৫ মিলিগ্রাম/লিটার মাছচাষের জন্য ভাল।	পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা কমানো যেতে পারে।
হাইড্রোজেন সালফাইড	০.০০৩ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম।	তলদেশে খুব বেশি এ গ্যাস জমে গেলে হড়রা টেনে তা দূর করা যেতে পারে।
জৈব পদার্থ	৩-৪ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ক্যালসিয়াম	৪০-৫০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা যেতে

২০২৫

		পারে।
পটাশিয়াম	৩-৪ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	উল্লেখিত পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে শতাংশ প্রতি ৭৫ গ্রাম হারে মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
ক্লোরাইড	স্বাভাবিক মাত্রা ৭ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি।	উল্লেখিত উপাদানের ঘাটতি থাকলে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন	সেক্কিডিস্ক রিডিং ১ ফুট পর্যন্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য।	সারের মাত্রা কমবেশি করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
প্রাণি প্ল্যাংকটন	গ্লাস প্রতি ৮-১০টি।	জৈব সারের মাত্রা কমবেশি করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ:

রহিম সাহেব তাঁর পুকুরে মাছ চাষ করেন কিন্তু আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়ায় পরামর্শ গ্রহনের জন্য তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট আসলে তোমার শ্রেণি শিক্ষক তোমায় পুকুর পরিদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দিতে বললেন। পুকুর পরিদর্শন শেষে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
ঠিকানা	
পুকুরের মাটির ধরন	
পুকুরের পাড়ে কি কি গাছপালা আছে তাদের নাম	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.
পুকুরের পানিতে আগাছা থাকলে তাদের নাম	১. ২. ৩
পানির রঙ কেমন?	
পুকুরের পানির গভীরতা কত?	
পানির P^H কত?	
পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেনের পরিমান কত?	
পানির উপর কোন লাল/সবুজ স্তর আছে কিনা?	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
জমাদানের তারিখ	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

মৎস্য চাষের পুকুরের পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুনাবলিসমূহের নাম ও মাত্রা লেখ।

ক্রম.	গুনাবলী	নাম	মাত্রা
০১	ভৌত গুণাবলী		
০২	রাসায়নিক গুনাবলী		
০৩	জৈবিক গুনাবলী		

জব ১: পুকুরের মাটির গঠন পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- ভূমির বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করা।
- উপযুক্ত কাচের গ্লাস বা বিকার ব্যবহার করা।
- মাটি পানিতে ভালভাবে দ্রবীভূত করা।
- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি থিতানোর জন্য অপেক্ষা করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগলস	কাচ/উন্নত মানের প্লাষ্টিক, চায়না	১ জোড়া
০৪	গামবুট	রাবারের, মাপমত	১ জোড়া
০৫	গামছা	সুতি দেশি ৫ ফুট লম্বা	১ টি
০৭	ডেটল	মেডিকেল গ্রেড	১ বোতল
০৮	কটন	মেডিকেল গ্রেড	১ রোল ছোট
০৯	ইনজুরি টেপ	মেডিকেল গ্রেড	৫ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	কোদাল	দেশী	১ টি
০২	নিড়ানী	লোহার	১ টি
০৩	গামলা	প্লাষ্টিক, ১৫ লিটার	২ টি
০৪	গ্লাস	কাচের	৪ টি
০৫	চামচ/নাড়ানি	লোহার	৪ টি
০৬	স্কেল	স্টিলের, ১ মিটার	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	পরিষ্কার পানি	আয়রনমুক্ত ট্যাপের পানি	পরিমানমত

২০২৫

(ঘ) কাজের ধারা:

১. পুকুর খননের বিভিন্ন স্থান থেকে নমুনা মাটি সংগ্রহ কর।

২. পরিষ্কার পানি ভর্তি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস বা বিকারে নির্দিষ্ট পরিমান মাটি রাখ।

৩. একটি চামচ বা নাড়ানি দিয়ে পানিতে মাটি ভাল করে গুলাতে থাকি, যতক্ষন পর্যন্ত না মাটি পানিতে সম্পূর্ণ ভাবে দ্রবীভূত হয়।

৪. নাড়ানো বন্ধ কর এবং অপেক্ষা কর।

৫. কাচের গ্লাস বা বিকারের তলায় স্তরে স্তরে মাটির তলানী জমা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

৬. কাচের গ্লাস বা বিকারের তলায় খুব দ্রুত গতিতে বালি কণা প্রথমে তারপর মধ্যম গতিতে পলিকণা এবং সর্বশেষ ও খুব ধীর গতিতে এঁটেল কণা জমতে শুরু হওয়া পর্যবেক্ষণ কর।

৭. কাচের গ্লাস বা বিকার খুব সুক্ষভাবে বাহির থেকে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. গ্লাসের একেবারে নিচে বালি কণা তার উপর পলিকনা এবং সবার উপরে এঁটেল বা কাদা মাটির কণার স্তর পর্যবেক্ষণ কর।

৯. এবার স্কেল দিয়ে বিভিন্ন মাটির স্তর পরিমাপ করে আমরা উক্ত স্থানের মাটির গঠন জান।

১০. মাটির গঠন পর্যবেক্ষন করে উক্ত জায়গা পুকুর কাটার উপযুক্ত কিনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

কাজের সাবধানতা:

- মাটি খননের সময় অতি সাবধানতার সাথে কোদাল ব্যবহার করবে
- পানির সাথে মাটি মিশ্রিত করার সময় তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে ৭০-৮০ % ফলাফল সঠিক পাওয়া যায়।
- কোন সময়ই ১০০% ফলাফল সঠিক পাওয়া যাইনা বিধায় খুব সাবধানতা অবলম্বন করে পরীক্ষাটি করতে হয়।

আত্ম প্রতিফলন :

পুকুরের মাটির গঠন পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: পুকুরের পানির পি এইচ (P^H) নিয়ন্ত্রনে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন সংগ্রহ করা।
- P^H (পিএইচ) স্কেল সংগ্রহ করা।
- পানিতে ডুবানোর পরে P^H (পিএইচ) পেপার খুব সর্কতার সাথে পিএইচ স্কেলের সাথে মিল করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগলস	কাচ/উন্নত মানের প্লাষ্টিক	১ জোড়া
০৪	গামবুট	রাবারের, মাপমত	১ জোড়া
০৫	গামছা	সুতি দেশি ৫ ফুট লম্বা	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বালতি	১৫ লিটার	১ টি
০২	বিকার	২০০-৫০০ মি.লি.	৩ টি
০৩	কালো বোতল	২৫০ মি.লি.	৪ টি
০৪	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০ লিটার	২ টি
০৫	কাঠের/লোহার হাতল	প্রমাণ আকার	১ টি
০৬	স্টিলের বাটি	২ লিটার	২ টি
০৭	খাতা	প্রয়োজনমত	১ টি
০৮	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	১ টি
০৯	P^H (পি এইচ) মিটার	ডিজিটাল সাধারন মানের	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	P^H (পিএইচ) স্কেল ও পেপার	ডিজিটাল সাধারন মানের	১ টি
০২	তেঁতুল	দেশী	১ কেজি
০৩	তেঁতুলের ডাল	দেশী	পরিমানমত
০৪	চুন	সাধারন	১০ কেজি

(ঘ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পানির P^H পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান কর।

৩. পুকুরের পানির P^H পরিমাপের জন্য যথা সম্ভব পুকুরের মাঝামাঝি থেকে পানি মগে করে বা বালতিতে করে সংগ্রহ কর অথবা কালো বোতলে করে ল্যাবরোটরীতে এনে পরীক্ষা কর।

৪. সংগৃহিত পানিতে P^H পেপার ডুবিয়ে উপরে উঠায়ে দেখ P^H যে পেপারের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে এবার P^H স্কেলের সাথে পরিবর্তিত পেপারের বর্ণ মিলিয়ে পুকুরের পানির P^H এর পরিমাণ নির্ধারণ কর অথবা পানিতে ডিজিটাল P^H মিটার ডুবিয়ে পানির P^H এর পরিমাণ নির্ধারণ কর।

৫. পুকুরের পানির P^H যদি আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে তবে বাড়ানোর জন্য প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত চুন প্রয়োগ কর, সাত (০৭) দিন পর আবার পরীক্ষা কর যদি P^H এর পরিমান না বাড়ে তবে আবার সম পরিমান চুন প্রয়োগ কর।

৬. আর পুকুরের পানির P^H যদি আদর্শ মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে তবে কমানোর জন্য বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি থেকে ২ কেজি পর্যন্ত তেতুল গুলিয়ে সারা পুকুর ছিটিয়ে দাও।

৭. তেঁতুল পাওয়া না গেলে তেঁতুলের ডাল কেটে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রেখে পরের দিন সকালে তুলে ফেল অথবা নলকূপের পানি সরবরাহ কর।

কাজের সাবধানতা :

- পানিতে ডুবানোর পর পিএইচ পেপার (P^H) পিএইচ (P^H) সূচকের সাথে মিলানোর সময় অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে চোখের ভ্রম না ঘটে।
- চুন বা তেঁতুলের পানি ছিটানোর পর পরই পরিমাপ করে দেখতে হবে যেন P^H এর পরিমান ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে অবস্থান করে।

আত্ম প্রতিফলন :

পুকুরের পানির পিএইচ (P^H) নিয়ন্ত্রনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: পুকুরের পানির অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- অক্সিজেনের (O_2) মিটার সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে পানি সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে যন্ত্র পরিচালনা করা।
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম :

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লোভস	রাবারের দেশি	১ জোড়া
০৩	গগল্স	কাচ/উন্নত মানের প্লাষ্টিক	১ জোড়া
০৪	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	সুতি, ৫ ফুট	১ টি
০৬	ছাতা	দেশি	১ টি
০৭	রেইন কোট	ওয়াটার প্রুফ কাপড়ের	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বিকার	কাচের	১ টি
০২	কাল বোতল	প্লাষ্টিকের	৪ টি
০৩	অক্সিজেন (O_2) মিটার	ডিজিটাল	১ টি
০৪	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	দেশি, ২০ লিটার	২ টি
০৫	স্টিলের বাটি	দেশি, ২ লিটর	২ টি
০৬	খাতা	সাদা কাগজের ৫০ পাতার	১ টি
০৭	পেন্সিল	২ বি	১ টি
০৮	ঝুড়ি	বাঁশের, দেশি	২ টি
০৯	বিদ্যুৎ চালিত এরেটর	বড় উন্নত মানের	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট	মার্ক	৫০০ গ্রাম

(ঘ) কাজের ধারা:

১. পুকুরের পানির অক্সিজেন (O_2) পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান কর।

৩. পুকুরের পানির অক্সিজেন (O_2) পরিমাপের জন্য যথা সম্ভব পুকুরের মাঝামাঝি থেকে পানি মগে করে বা বালতিতে করে সংগ্রহ কর অথবা কাল বোতলে করে ল্যাবরোটরীতে এনে পরীক্ষা কর।

৪. সংগৃহিত পানিতে ডিজিটাল অক্সিজেন (O_2) মিটার ডুবিয়ে পানির অক্সিজেন (O_2) এর পরিমান নির্ধারণ কর।

৫. পুকুরের পানির অক্সিজেন (O_2) যদি ৩ ppm এর চেয়ে কম থাকে তবে বৃদ্ধির জন্য পুকুরে কৃত্রিম ঢেউ সৃষ্টি করা, এরেটর চালানো, বাহির থেকে পানি সরবরাহ ইত্যাদি পদ্ধতিতে পুকুরে অক্সিজেন (O_2) এর পরিমান বৃদ্ধি কর।

কাজের সাবধানতা:

- পুকুরের পানির উপরের দিকের অক্সিজেন (O_2) অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে কমতে থাকে বলে সব স্তরের পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে
- এসব প্রক্রিয়ায় সাময়িক ভাবে অক্সিজেন বৃদ্ধি পেলেও অক্সিজেন (O_2) কমে যাওয়ার কারন অনুসন্ধান করে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক

আত্ম প্রতিফলন :

পুকুরের পানির অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধিতে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- থার্মোমিটার মিটার সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে পানি সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম :

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লোভস	রাবারের দেশি	১ জোড়া
০৩	গগল্স	কাচ/উন্নত মানের প্লাষ্টিক	১ জোড়া
০৪	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	সুতি, ৫ ফুট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বিকার	কাচের, চায়না	১ টি
০২	কাল বোতল	প্লাষ্টিকের	৪ টি
০৩	থার্মোমিটার	চায়না, সেন্টিগ্রেড	১ টি
০৪	স্টিলের বাটি	দেশি, ২ লিটর	২ টি
০৫	এয়ারেটর	৫ অশ্ব শক্তি	১ টি
০৬	বাঁশ	১০ ফুট	২ টি
০৭	পানির পাম্প	২ অশ্ব শক্তি	১ টি
০৮	পেন্সিল	২ বি	১ টি
০৯	খাতা	৫০ পাতা, সাদা কাগজ	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান কর।

৩. পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যথা সম্ভব পুকুরের মাঝামাঝি ও পুকুরের উপর, মধ্যম ও নিম্ন ভাগ থেকে পানি মগে করে বা বালতিতে করে সংগ্রহ কর এবং পরিমাপ কর।

৪. তাপমাত্রা ৩১° C এর বেশি হলেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যবস্থা হিসাবে পুকুরের পানি পরিবর্তন বা এয়ারেটর চালনা বা পুকুরের এক কোনে আগাছা জমা করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা কর।

কাজের সাবধানতা:

- পুকুরের পানির উপরের দিকের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে কমতে থাকে বলে মাঝের স্তরের পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন :

পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: জলাশয়ের বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে জলজ উদ্ভিদ সমূহ সনাক্ত করা।
- সঠিক ভাবে জলজ উদ্ভিদ সমূহের নমুনা সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে জলজ সমূহের নমুনা সংরক্ষণ করা।
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম :

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগল্স	দেশি	১ জোড়া
০৪	গামবুট	প্লাষ্টিক	১ জোড়া
০৫	গামছা	দেশী সুতির তৈরী	১ টি
০৬	রেইন কোর্ট	ওয়াটার প্রুফ কাপড়ের	১ টি
০৭	লাইফ জ্যাকেট	রাবারের	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বিকার	কাচের, ২০০-৫০০ মি.লি.	৪ টি
০২	গামলা	প্লাস্টিকের, ১৫ লি.	২ টি
০৩	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	দেশি, ২০ লি.	২ টি
০৪	বালতি	প্লাস্টিকের, ১৫ লি.	২ টি
০৫	দা	লোহার	১ টি
০৬	কাস্তে	লোহার	১ টি
০৭	নিউজ পেপার	অব্যবহৃত	প্রয়োজনমত
০৮	পেন্সিল	২ বি	১ টি
০৯	খাতা	দেশি সাদা খাতা ৫০ পাতার	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।
২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান কর।
৩. ভিন্ন ভিন্ন জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন গামলা/বালতিতে রাখ।
৪. সংগ্রহ শেষে উদ্ভিদগুলো চিহ্নিত কর।
৫. চিহ্নিত করণের পর আগাছাগুলো নিউজ পেপারের ভিতর রেখে সংরক্ষণ কর।
৬. উদ্ভিদগুলো নিউজ পেপারের ভিতর শুকিয়ে গেলে জলজ উদ্ভিদের এলবাম তৈরি কর।

কাজের সাবধানতা:

- জলজ উদ্ভিদ পুকুর থেকে সংগ্রহ করার সময় খুব সাবধানে সংগ্রহ করতে হবে কারণ জলজ উদ্ভিদের ভিতর পোকা-মাকড় সহ অনান্য বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে বিধায় সাবধানে থাকতে হবে
- কিছু উদ্ভিদ সংগ্রহ করার সময় পানির ভিতর নামতে হয় বলে সুরক্ষা পোষাক অবশ্যই পরিধান করার পাশাপাশি লাইফ জ্যাকেট পরিধান করতে হবে

আত্ম প্রতিফলন :

জলাশয়ের বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ সনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ?

২. মাটি প্রধানত কয় প্রকার ?

৩. পুকুর খননের জন্য উপযুক্ত মাটি কোনটি ?

৪. পুকুর খননের জন্য মাটির পিএইচ (P^H) কত হওয়া উচিত ?

৬. মাছ চাষে পানির গুণাগুনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

৭. মাছের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?

৮. পুকুরে দৈনিক কত ঘন্টা আলো পড়া প্রয়োজন ?

৯. পুকুরের পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রধান উৎস কী ?

১১. পুকুরের পানির পিএইচ (P^H) কত হলে মাছ চাষের জন্য উত্তম ?

১৩. মাছ চাষের পুকুরের পানিতে এমোনিয়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ কত হওয়া উচিত ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. মাটি বলতে কী বোঝায় ?

২. মাটির উপাদান গুলোর শতকরা পরিমান লেখ।

৩. মাছ চাষের পুকুরের পানির বর্ণ কেমন হওয়া উত্তম?

৪. মাছের বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব লেখ।

৫. পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎসগুলোর কী কী ?

৬. পুকুরের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার কারণগুলো কী কী ?

৭. কোন পুকুরে বেন্থোজ বেশি জন্মে আর কোন পুকুরে কম জন্মে ?

৮. পুকুরের পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উৎসগুলোর নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. পুকুর খননের জন্য মাটির গঠন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার যে কোন একটি পদ্ধতি বর্ণনা করো।

২. পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিলে তা কিভাবে প্রতিকার করবে ব্যাখ্যা করো।

৩. জলজ পরিবেশের ভাসমান জীবকুলের প্রভাব বর্ণনা করো।

৪. মাছ চাষের পুকুরের এমোনিয়া ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করো।

৫. মাছ চাষে পানির ভৌত গুণাগুণগুলোর বর্ণনা দাও।

৬. মাছ চাষে পানির রাসায়নিক গুণাগুণগুলোর বর্ণনা দাও।

৭. মাছ চাষে পানির জৈবিক গুণাগুণগুলোর বর্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ

Mixed Culture of Carp Fishes





সঠিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ওপর মাছের দেহের বৃদ্ধি, পুকুরের উৎপাদন এবং সর্বোপরি মাছ চাষির লাভ ক্ষতি নির্ভর করে। মাছ চাষ বলতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পুকুর প্রস্তুত, সুস্থ ও উন্নত মানের পোনা মজুদ, সঠিক পদ্ধতিতে পোনা ছাড়া, নিয়মিত খাদ্য প্রদান ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বোঝায়। এ অধ্যায়ে এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সঠিক পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার সাথে সাথে নিজেকে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুত করতে পারব
- সুস্থ ও সবল পোনা শনাক্তকরণ করতে পারব
- পুকুরে মাছের পোনা সঠিকভাবে মজুদ করতে পারব
- পুকুরে পোনা মজুদ পরবর্তী কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারব
- মৎস্য চাষের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারব

৩.১ মাছ চাষ

একটি পুকুর বা দীঘি বা যে কোন জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে যে মাছ উৎপাদান হয় বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে তার চেয়ে যদি বেশী মাছ উৎপাদন করা যায়, তবেই তাকে মাছ চাষ বলে। বিভিন্ন কলাকৌশল বলতে আগাছা অপসারণ, রাক্ষুসে প্রাণী দূরীকরণ, সার ও খাদ্য প্রয়োগ, রোগ-বালাই দমন ও পর্যাপ্ত আলো বাতাস নিশ্চিতকরণ বোঝায়। তাই মাছ চাষ আধুনিক কৃষি কাজের মতোই একটি প্রক্রিয়া মাত্র। অন্যভাবে বলা যায়, নিয়ন্ত্রিত অথবা আধা-নিয়ন্ত্রিতভাবে যখন মাছ লালন পালন করা হয় তখন তাকে মাছ চাষ বলে। পুকুর অথবা কোন জলাশয়ে কিছু মাছ এমনিতেই থাকে যাকে মাছ চাষ বলা যায় না। রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ বলতে সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়, উন্নত ব্যবস্থাপনায় বদ্ধ জলাশয়ে (যেমন-পুকুর) রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, সরপুটি, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদি প্রজাতির মাছের একত্রে চাষ করাকে বোঝায়। মাছের চাষ দুই ধরণের হতে পারে :

ক) একক মাছ চাষ বা এক প্রজাতির মাছ চাষ

যখন পুকুরে শুধুমাত্র একটি প্রজাতি বা জাতের মাছের চাষ করা হয় তখন তাকে একক মাছচাষ পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- একটি পুকুরে শুধুমাত্র নাইলোটিকা অথবা গলদা চিংড়ি অথবা মাগুর অথবা পাঙ্গাস মাছের চাষ। এই একক মাছ চাষ পদ্ধতিতে কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে তা হলোঃ

সুবিধাসমূহঃ

- নিবিড়ভাবে মাছ চাষ সম্ভব
- খাদ্য গ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্ভাবনা কম
- একটি প্রজাতির ওপর ব্যাপক জ্ঞানলাভ সম্ভব
- ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে সহজ

অসুবিধাসমূহঃ

- পুকুরের প্রতিটি স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না
- সার্বিক উৎপাদন কম হয়
- শুধুমাত্র ছোট পুকুরেই এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ সহজ

খ) মিশ্রচাষ বা একের অধিক প্রজাতির মাছ একসাথে চাষ

যদি পুকুরে দুই বা ততোধিক প্রজাতি বা জাতের মাছ একসাথে চাষ হয়, তাকে মিশ্রচাষ পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- কাতলা, রুই, মৃগেল, মিরর কার্প ও সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি অথবা কাতলা, রুই, গ্রাসকার্প ও গলদা চিংড়ির একসাথে চাষ। এই মিশ্রচাষ পদ্ধতিতেও কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে তা হলোঃ

সুবিধাসমূহঃ

- মাছের উৎপাদন বেশী হয়
- আয় বেশী হয়
- মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেয়া সম্ভব হয়

২০২৫

- রোগ বালাই কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

অসুবিধাসমূহ:

- মাছের জাত নির্বাচন সঠিক না হলে ক্ষতি হতে পারে
- মাছের জাত অনুযায়ী খাদ্যের যোগান না হলে ভালো ফল পাওয়া যায় না
- মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভাবে কঠিন

৩.২ মাছচাষ ব্যবস্থাপনার ধরন

মাছ চাষ ব্যবস্থপনা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করার জন্যে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ এবং কার্য পদ্ধতির সমন্বিত ও যথার্থ ব্যবহার, যা দ্বারা সর্বাধিক সহনশীল পর্যায়ে বাণিজ্যিক, পারিবারিক এবং চিত্তবিনোদনের জন্য মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ মাটি, পানি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠনকে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধিকতর লাভজনক উৎপাদনই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। বর্তমানে প্রচলিত মাছ চাষ ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) সম্প্রসারণ মূলক পদ্ধতি: মৎস্যভুক ও অবাঞ্চিত মাছ সম্পূর্ণ দূর করা হয় না, খুব কম অথবা খুব বেশী মজুদ ঘনত্ব হয়, পানি বদল ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে না এবং মাঝে মধ্যে সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ) আধা নিবিড় পদ্ধতি: মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ, মধ্যম মজুদ ঘনত্ব, নিয়মিত সার এবং হাতের তৈরী খাদ্য প্রয়োগ, পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর থেকে আংশিকভাবে মাছ ধরা শুরু এবং প্রয়োজনে পানি বদল ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

গ) নিবিড় পদ্ধতি: নিয়মিত পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের আধুনিক ব্যবস্থা, উন্নত মানের সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ এবং উচ্চতর মজুদ ঘনত্ব।

৩.৩ কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ:

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষের সময় করণীয় কাজ সমূহকে তিন (০৩) টি ভাগে ভাগ করা যায় যথা:

ক) পুকুর প্রস্তুতি বা পোনা মজুদপূর্ব কাজসমূহ: পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরে যেসব কাজ করণীয় বা করা হয় তাদের সব গুলোকে একত্রে পুকুর প্রস্তুতি বলে। এক্ষেত্রে যেসকল নিয়ম-নীতি ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হয় তা হলো-

(১) মাছচাষ পরিকল্পনা: মাছ চাষের শুরুতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মাছচাষের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। মৌসুমী না বাৎসরিক পুকুরে মাছচাষ করা হবে, আধা নিবিড় না নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষ করা হবে, পাংগাস না কার্পজাতীয় মাছচাষ করা হবে, মজুদকৃত মাছের জন্য খাদ্যের উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক খাদ্য না পিলেটজাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভর করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্যই আগে থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যাহোক সামর্থ অনুযায়ী কোন ধরণের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে এবং সেই ধরণের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা অবশ্যই জেনে নিয়ে সেই আঙ্গিকে পরিকল্পনা মাফিক মাছচাষ শুরু করতে হবে। কথায় বলে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অর্থ

সংশ্লিষ্ট কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করা। তাই মাছচাষ শুরুর পূর্বেই সঠিকভাবে মাছচাষ পরিকল্পনা করা অত্যাবশ্যক।

(২) মৎস্য খামার বা পুকুর খননে স্থান নির্বাচন: মাছের খামার কিংবা মাছ চাষের উদ্দেশ্যে পুকুর খননের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযোগী এমন স্থানে মাছ চাষের পুকুর তৈরি আবশ্যক। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি হলে পরবর্তী বছরে সেটা শোধরানো সম্ভব। কিন্তু পুকুর খননকালে স্থান নির্বাচনে কোন ভুলত্রুটি হলে সেটা শোধরানো সম্ভব নয়। কারণ পুকুর খননে সিংহভাগ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। কাজেই পুঁজির সর্বাধিক সদ্ব্যবহার এবং খামার পরিচালনায় সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচন, সঠিক নক্সা বা ডিজাইন অবলম্বন এবং পুকুরের বিভিন্ন অংশ যথাযথভাবে নির্মাণ, সফল মাছ চাষের পূর্বশর্ত। নিচে পুকুর খননে স্থান নির্বাচনকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো-

পুকুর খননে স্থান নির্বাচনকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

i) ভূমির প্রকৃতি: তুলনামূলকভাবে নিচু এলাকায় পুকুর খনন করা উচিত।পাহাড় বা টিলার ঢালে পুকুর খনন ঠিক নয়। কারণ সেখানে পানি ধরে রাখা কঠিন ।পুকুর খননের পর পাড় যে পরিমাণ উঁচু হবে তা মাঝারি ধরণের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন জায়গা নির্বাচনের ওপর জোর দিতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে বন্যায় বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে। নিচু স্থানে পুকুর খনন করলে ভেজা মাটি দ্বারা ভালভাবে পাড় নির্মাণ করা যায় এবং কম গভীরতায় যথেষ্ট পানি ধরে রাখা যায় বলে নিচু এবং বন্যামুক্ত স্থান পুকুর খননের জন্য সবচেয়ে ভাল।

ii) মাটির বৈশিষ্ট্য: পুকুর তৈরির জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যে স্থানের মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। মাছ চাষের পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি থাকা প্রয়োজন। তাই প্রথমে দেখতে হবে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কেমন। মোটা কাঁকর যুক্ত মাটি কিংবা বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। লাল মাটির এলাকায় এবং এঁটেল মাটিতে পুকুর খনন করলে পানি প্রায় সময়ই ঘোলা থাকে। কারণ এ ধরণের মাটির কণাগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্ম যা সহজে থিতায়না। আর পুকুরের পানি ঘোলা থাকলে সূর্যের আলো পানির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এতে পুকুরের উর্বরতা শক্তি তথা খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। ফলে মাছের ফলনও ভাল হয় না। পুকুর খননের জন্য এঁটেল-দোঁআশ মাটি সবচেয়ে ভাল। এ মাটির উর্বরতা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা দু'টোই সন্তোষজনক। তবে এলাকায় নেহায়েত ভাল মাটি পাওয়া না গেলে যে মাটিই পাওয়া যাক না কেন সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার যেমন- গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, কম্পোস্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে তলদেশের উন্নয়ন সাধন তথা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

iii) বন্যামুক্ত স্থান নির্বাচন: পুকুর খননের জন্য নির্বাচিত স্থান অবশ্যই বন্যামুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নিচু এলাকায় বন্যার আশঙ্কা থাকলে সম্মিলিত উদ্যোগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করতে পারলে পুকুরের পাড় বেশি উঁচু করার প্রয়োজন হয় না।

iv) পানির উৎস ও গুণাগুণ: পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় এমন স্থানে পুকুর খনন করা উচিত। আধুনিক পন্থায় মাছ চাষের জন্য সারা বছর পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির প্রয়োজন। আমাদের দেশে পুকুরগুলো সাধারণত বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল। কেবলমাত্র মাছচাষের উদ্দেশ্যে নতুন পুকুর করতে হলে তার পাশে

নির্ভরযোগ্য পানির উৎস থাকা বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে শুধু পানির পরিমাণই যথেষ্ট নয়, পানির গুনাগুণও সমগুরুত্বপূর্ণ। যে উৎস হতে পুকুরে পানি সরবরাহ করা হবে কোন ক্রমেই সেই উৎস যেন দূষিত না হয়। আবার পানি স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্চনীয়, ঘোলা পানি পুকুরের উৎপাদন শক্তি হ্রাস করে। তাছাড়া ভাসমান সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কণা মাছের ফুলকায় জমে শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে। ভাল ফল লাভের ক্ষেত্রে পানির উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের গুনাগুনকেও সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

v) আলো বাতাসের ব্যবস্থা: পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাওয়া যায় এমন খোলামেলা স্থানে পুকুর খনন করা উচিত। পুকুর পাড়ে ঘন গাছপালা ও ঘরবাড়ি থাকলে অথবা পুকুরে প্রচুর পরিমাণ কচুরিপানা থাকলে আলো-বাতাস বাধা পায়। পুকুরে সূর্যের আলো না পড়লে অথবা কম পড়লে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। অন্য দিকে বাতাসে পানি আন্দোলিত না হলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে এবং এতে মাছের মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুতরাং পুকুর খননের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পাওয়া যায়।

vi) যোগাযোগ ব্যবস্থা: মৎস্য খামার বা পুকুরের সঙ্গে অবশ্যই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা পাকা রাস্তা থাকা প্রয়োজন। তা নাহলে অধিকাংশ সময়ই উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করা যায় না। এ ছাড়াও পুকুরে প্রতিনিয়ত কাজের জন্য যেমন- পোনা পরিবহন, খাদ্য, সার, ঔষধপত্র, জালসহ নানারকম জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করতে হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না হলে এসব জিনিসপত্র সময়মত আনা-নেয়া কষ্টকর বা পরিবহন খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে লাভের অংশ অনেক কমে যাবে। তাই নতুন পুকুর কিংবা খামার নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনকালে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

vii) উপকরণের প্রাপ্যতা: উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ করতে হলে নানাবিধ জিনিসপত্র যেমন-মাছের পোনা, খাদ্য, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, মাছ আহরণ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। দেশের একান্তই প্রত্যন্ত অঞ্চলে খামার বা পুকুর খনন করা হলে এবং যেখানে ধারে কাছে এসব উপকরণ পাওয়া না গেলে খামার পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে এমন প্রত্যন্ত অঞ্চল খুবই কম, যেখানে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা কিংবা পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। তাছাড়া মাছ চাষের জন্য যেসব জিনিস দরকার সেগুলো সচরাচর ধারে-কাছেই পাওয়া যায়। আর কিছু কিছু জিনিস আছে যা বছরে দু'একবার প্রয়োজন হয়। সেগুলো বছরের প্রথমেই কিনে রেখে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

viii) নিরাপত্তা ব্যবস্থা: মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সমস্যা দু'ধরণের, পুকুরের মাছসহ অন্যান্য মালামালের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, অন্যটি হলো বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক সমস্যা। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বসতবাড়ির কাছাকাছি পুকুর নির্বাচন করা যাতে খুব সহজেই পুকুর বা খামার দেখাশুনা করা যায়। আর বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধানকল্পে বাঁধ নির্মাণ করা এবং গভীর কিংবা অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। সম্ভব হলে এসব ব্যবস্থা নেয়ার পরই কেবল নির্ধারিত স্থানে খামার কিংবা পুকুর নির্মাণের কাজ শুরু করা উচিত।

ix) বিদ্যুতের ব্যবস্থা: নিবিড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে খামার বা পুকুরে অবশ্যই বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সময়মত পুকুরে পানি পরিবর্তন, আলোর ব্যবস্থাকরণ সহ পুকুরের পানিতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন বাড়ানোর

যন্ত্র চালানোর জন্যও বিদ্যুতের প্রয়োজন। তাই খামার বা পুকুর নির্বাচনের আগে অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে পরে পুকুর নির্মাণ করতে হবে।

x) **বাজারজাতকরণের সুবিধা:** মাছ দ্রুত পঁচনশীল পণ্য।একই ওজনের তাজা মাছ আর পঁচা মাছের বাজার মূল্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে মাছ বাজারজাতকরণ করতে না পারলে অনেক সময় লাভের অংশ কমে যায়। তাই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মাছ বাজারজাতকরণ করতে পারলে লাভের অংশ বেড়ে যায়। বাজারজাতকরণের সুবিধা নাই এমন স্থানে পুকুর বা খামার স্থাপন করে বেশি লাভবান হওয়া যায় না।

(৩) পুকুরের আকার, আয়তন, গভীরতা নির্ণয় এবং পাড় মেরামত করা: মাছচাষ ব্যবস্থাপনার ধরণ অনুযায়ী পুকুর যেকোন আকার এবং আয়তনের হতে পারে। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মজুদ পুকুরের আয়তন ১ (এক) একর এবং তা আয়তাকার উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হলে সবচেয়ে ভাল হয়। কারণ উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হলে বছরের যেকোন ঋতুতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস লাগবে ফলে পুকুরের পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি হবে যা পানিতে অক্সিজেন মেশাতে সহায়তা করবে। মাছচাষ কার্যক্রমের ধরণ অনুযায়ী পুকুরের পানির গভীরতা হলে সবচেয়ে ভাল হয়। যেমন- মজুদ পুকুরের জন্য ৬ ফুট এবং নার্সারি পুকুরের জন্য ৩ ফুট গভীরতা হলো আদর্শ গভীরতা। পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের পরে পুকুর প্রস্তুতির সঠিক নিয়মাবলী অনুসরণ করতে করতে হবে।



চিত্র- ৩.১ আয়তাকার পুকুর

পুকুরের আয়তন নির্ধারণ পদ্ধতি :

যে কোন পুকুরের আয়তন নিম্নে বর্ণিত সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।

পুকুরের আয়তন (শতাংশ) = দৈর্ঘ্য (ফুট)×প্রস্থ (ফুট)/৪৩৫.৬

যেমন- কোন পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট হলে

পুকুরের আয়তন হবে = ১১.৪৮ শতাংশ। (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)

২০২৫

আবার পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মাপ যদি ফুটে না নিয়ে মিটারে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে

পুকুরের আয়তন (শতাংশ)= দৈর্ঘ্য (মিটার) × প্রস্থ (মিটার)/৪০.৪৮

যেমন- পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ মিটার হলে

পুকুরের আয়তন হবে = ১২৩.৫২ শতাংশ। (৪০.৪৮ বর্গমিটারে ১ শতাংশ)

পুকুরের পাড় মেরামত করা: মাছচাষের পুকুরে আশানুরূপ উৎপাদনের জন্য শুরুতেই পুকুর যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। পুকুর প্রস্তুত করার মূল উদ্দেশ্য হল মাছের জন্য নিরাপদ আবাস, উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা আর সেই ক্ষেত্রে শক্ত, উচু আর মজবুত পাড় হচ্ছে মাছের নিরাপদ আবাসনের পূর্ব শর্ত পুকুরের পাড় মেরামতের সময় যা করতে হবে তা আমরা অনেকেই জানি না। মাছ চাষ করার জন্য পুকুরের পাড় মেরামত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাছ চাষের পুকুরের পাড় ঠিক না থাকলে মাছচাষে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। কোন কারণে পুকুরের পাড় ভেঙে গেলে তা দ্রুত মেরামত করতে হবে।



চিত্র ৩.২ পুকুরের ভাংগা পাড়

কেন পাড় মেরামত করতে হবে:

- পুকুরের পানি যেন বাইরে বের হতে না পারে
- বৃষ্টির/বন্যার পানি যেন পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে
- অপ্রয়োজনীয় মাছ এবং রাক্ষুসে প্রানী যেন সহজে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে
- পুকুর পাড়ে সবজী চাষ করার সুযোগ করা যায়

পুকুরের পাড় মেরামতের সময় লক্ষণীয়:

(১) মাছ চাষের পুকুরের পাড় মেরামত করার সময় পুকুরের পাড় যদি ভাঙা থাকে তাহলে ভাঙা স্থানে শুকনো মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কোন ভাবেই যাতে ভরাট করার মাটি পুকুরে না পড়ে যায়। মাটি পুকুরের পাড় থেকে পুকুরে পড়ে গেলে মাছের ক্ষতি হতে পারে।

(২) পুকুরের পাড় এমনভাবে মেরামত করতে হবে যাতে কোনভাবেই পুকুরের পানি বাইরে যেতে না পারে আবার বাইরের পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। বাইরের দূষিত পানি পুকুরে প্রবেশ করলে পুকুরে চাষ করা মাছের ক্ষতি হতে পারে।

(৩) পুকুরের পাড় শুকনো মাটি দিয়ে মেরামত করার পর সেখানে পানি দিয়ে হালকা করে ভিজিয়ে দিতে হবে। তারপর পুকুরের পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। পুকুরের পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিলে পুকুরের পাড় মজবুত হবে এবং পুকুর পাড়ের মাটি সহজে ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

(৪) পুকুরের পাড় মেরামত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনভাবেই পুকুরের পানি ঘোলা না হয়। পুকুরের পানি ঘোলা হলে মাছচাষে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই যাতে পুকুরের পানি ঘোলা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) মাছ চাষের পুকুরের পাড় মেরামত করার সময় পুকুরের অতিরিক্ত বড় গাছ যেগুলো মাছ চাষের ক্ষতি করে থাকে সেগুলোকে কেটে ফেলতে হবে। এছাড়াও পুকুরে রোদের বাঁধা দেয় এমন গাছগুলোকেও কেটে ফেলতে হবে। এতে করে মাছ চাষের পুকুরের পরিবেশ ঠিক থাকবে।

(৬) পুকুর এমনভাবে মেরামত করতে হবে যাবে কোনভাবেই মাছ পুকুর থেকে উঠে যেতে না পারে। এজন্য পুকুরের পাড় মেরামত করার সময় পাড় এমনভাবে মেরামত করে উচু করে দিতে হবে যাতে কোন মাছ পুকুর থেকে উঠে যেতে না পারে।



চিত্র- ৩.৩ মজবুত পাড়যুক্ত পুকুর

(৪) জলজ আগাছা

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের জলজ উদ্ভিদ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে। পুকুরে কোনক্রমেই জলজ আগাছা রাখা যাবে না। জলজ আগাছা মাছ চাষের যেসকল ক্ষতি সাধন করে তা হলো:

- আগাছা মাটি ও পানি থেকে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে
- উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার কমে যায়
- পুষ্টিকর পদার্থের অভাবে প্ল্যাংকটন এবং সেই সাথে মাছেরও উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
- জলজ আগাছা মাছের চলাচল বাধা সৃষ্টি করে
- পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দেয়, ফলে সালোক-সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে মাছের খাদ্য ও অক্সিজেন তৈরি হতে পারে না
- কোন কোন সময় আগাছা মাছের রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল বা বাহক হিসেবেও কাজ করে
- এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাসমান আগাছা পুকুরের পানিতে থাকলে বাতাস পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি করতে পারে না ফলে পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ কম হয়
- মাছের শত্রু বিভিন্ন রোগ জীবাণু এবং রাক্ষুসে প্রাণী যেমন সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদির আবাসস্থল সৃষ্টি হয়
- রাতে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমিয়ে দেয়
- আগাছা পানিতে পচে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে
- জলাশয়ের আয়তন কমিয়ে দেয়।

কাজেই মাছচাষের পুকুরে জলজ আগাছা অপসারণ করতে হবে। এ কাজ পোনা মজুদের ১-২ মাস পূর্বে অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাসে করলে ভালো হয়। পুকুরের প্রতিবেশে বিভিন্ন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা থাকে। সচরাচর পুকুরে প্রাপ্ত জলজ উদ্ভিদকে ৫ ভাগেভাগ করা যায়। যথা-

(ক) শেওলা: ক্লোরোফিল বহনকারী সরল প্রকৃতির স্বভোজী অতি প্রাচীন একটি উদ্ভিদ দলই শৈবাল (Algae)। এরা শেওলা নামেও পরিচিত। সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে। দু-একটি ব্যতিক্রম প্রজাতি ছাড়া এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়। এরা এককোষী, বহুকোষী, ফ্লাজেলা বিশিষ্ট সুতার মতো, শাখান্বিত বা শাখাহীন। রঙের বৈচিত্রও অনন্য। বেশির ভাগই আণুবীক্ষণিক তবে কিছু আছে বিশাল আকারের। দৈর্ঘ্য ০.৫ মাইক্রোমিটার থেকে ৫০-৬০ মিটার পর্যন্ত হয়। যেমন- স্পাইরোগাইরা, ইউগ্লেনা ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.৪ শেওলা

(খ) ভাসমান আগাছা

এ গোত্রের সমস্ত আগাছা পানিতে ভেসে থাকে। এরা দুই ধরণের হতে পারে। যথা-

মুক্তভাবে ভাসমান : এরা পানিতে মুক্তভাবে ভেসে থাকে এবং পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে এরা বেঁচে থাকে। যেমন- কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.৫ মুক্ত ভাসমান আগাছা

মূল মাটিতে পাতা ভাসমান: এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে এবং পাতা পানিতে ভেসে থাকে এবং মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, যেমন শাপলা, পানিফল, শুশনি শাক ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.৬ মূল মাটিতে পাতা ভাসমান

(গ) অর্ধডুবন্ত ও ডুবন্ত আগাছা : এ সমস্ত আগাছা পানির তলদেশে থাকে। এদের মুল মাটিতে থাকে এবং পাতা বা প্রশাখা কখনই পানির উপরে আসে না। যেমন ঝাঁঝি, কাঁটাশেওলা, হাইড্রিলা ,নাজাস ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.৭ ডুবন্ত আগাছা

(ঘ) নির্গমনশীল আগাছা : এ ধরণের আগাছার শিকড় পানির নীচে মাটিতে থাকে এবং পাতা কখনো কখনো পানির উপর উঠে আসে। যেমন- বিষকাটালী, আড়াইল ইত্যাদি।

২০২৫



চিত্র-৩.৮ নির্গমনশীল আগাছা

(ঙ) লতানো আগাছা : এ সমস্ত আগাছার শিকড় পুকুরের ঢালু পাড়ে আটকানো থাকে এবং কান্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.৯ লতানো আগাছা

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ

পুকুরের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রধানত ৫ পদ্ধতিতে করা যায়। যথা-

(ক) কায়িক শ্রম: পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা বা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনো কখনো পুকুরে দাড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তোলা যায়।



চিত্র- ৩.১০ কায়িক পদ্ধতিতে আগাছা অপসারণ

(খ) জৈবিক: অনেক মাছ আছে, যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন- গ্রাস কার্প। তাছাড়া, মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে। ফলে তা হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যায়। জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্রাস কার্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র- ৩.১১ জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ

(গ) সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশী পরিমাণ অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। পুকুরে যদি ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন-কারা, নাজাজ ইত্যাদি থাকে তাহলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। ফলে সূর্যালোক না পাওয়ায় অল্প কয়েক দিনের ভেতর মারা যায়।



চিত্র- ৩.১২ সার প্রয়োগ পদ্ধতিতে শেওলা নিয়ন্ত্রণ

(ঘ) রাসায়নিক পদ্ধতি : জলজ আগাছা দমনের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হচ্ছে:

- ২-৪ ডি ১৩৮-১৮০ গ্রাম / শতাংশ ভাসমান এবং লতানো উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য
- সিমাজিন নামক রাসায়নিক দ্রব্য ৩ মি. গ্রা./ লিটার চারা জাতীয় উদ্ভিদ ধবংসের জন্য
- এনডোথল নামক রাসায়নিক দ্রব্য ১-৩ মি. গ্রা./ লিটার কেশরীয় উদ্ভিদ ধবংসের জন্য
- শেওলা জাতীয় আগাছা দমনের জন্য ৫ পিপিএম হারে জলাশয়ে কপার সালফেট বা তুঁতে দ্রবন প্রয়োগ করা হয়



চিত্র- ৩.১৩ রাসায়নিক প্রয়োগে পদ্ধতিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ

(ঙ) যান্ত্রিক পদ্ধতি: জলাশয়ের আগাছা দমনে যান্ত্রিক পদ্ধতি অতি আধুনিক পদ্ধতি, এই ক্ষেত্রে ভাসমান যন্ত্রের সাহায্যে পানির গভীর ঘন ও অপেক্ষাকৃত শক্ত আগাছা সহজে ও অল্প সময়ে দমন করা যায়।



চিত্র- ৩.১৪ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ

(৫) মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ:

জলজ আগাছা দমনের পরে পুকুর হতে অবশ্যই মৎস্যভূক ও অবাঙ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। যে সমস্ত মাছ চাষোপযোগী অন্যান্য মাছকে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন শোল, বোয়াল, গজার ইত্যাদি। এরা চাষোপযোগী মজুদকৃত মাছকে খেয়ে ফেলে। আর যে সমস্ত ছোট মাছ চাষোপযোগী অন্যান্য মাছকে খায় না, তবে চাষোপযোগী মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে, তাদেরকে অবাঞ্চিত মাছ বলে। যেমন- পুটি, দারকিনা, মলা ইত্যাদি।



চিত্র- ৩.১৫ মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ

পুকুরে যেসব মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ থাকে মাছের পোনা মজুদের পূর্বেই তা দুর করা আবশ্যক। যে সকল পদ্ধতিতে মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ দুর করা যায় তা হলো:

(ক) পুকুর শুকিয়ে: শীতের শেষ অথবা গ্রীষ্মকালে পুকুর খুব ভালো ভাবে শুকিয়ে উল্লেখিত সব ধরনের মাছ ধরে ফেরতে হবে। পুকুর শুকানোর পর অন্তত ৭-১৪ দিন পুকুর তলা কড়া রৌদ্রে ফেলে রাখতে হবে যাতে তলায় ফাটল ধরে।

(খ) রাসায়নিক পদ্ধতি: নিম্নের যে কোন ১টি পদ্ধতি রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করা যায়।

- টেবলেট (ফসটক্সিন/কুইকফস/ সেলফস): প্রতি শতাংশে ১ ফুট পানিতে ১টি টেবলেট, কড়া রৌদ্রে পুকুরের প্রত্যেক অংশে সমানভাবে টেবলেট ছিটিয়ে জাল টেনে দিতে হবে। মরা মাছ তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- তামাক পাতা: প্রতি শতাংশ পানিতে ২-৪ কেজি।
- রোটেনন: প্রতি শতাংশে ১ ফুট পানিতে ২৮-৩৫ গ্রাম (ছিটিয়ে)।
- ব্লিচিং পাউডার: প্রতি শতাংশে ১ ফুট পানিতে ৯০০ গ্রাম।
- মহুয়ার খৈল: প্রতি শতাংশে ১ ফুট পানিতে ৩ কেজি।

(গ) জাল টেনে: পুকুরে বারবার জাল টেনে আংশিকভাবে রাক্ষুসে মাছ দূর করা যায়।

(ঘ) পাথুরে চুন প্রয়োগ: গ্রীষ্মকালের কড়া রৌদ্রে শতাংশ প্রতি ৩-৪ কেজি পাথুরে চুন সরাসরি পুকুরে প্রয়োগ। এ পদ্ধতি অল্প গভীরতায় বেশী কার্যকর।

সতর্কতা:

রোটেনন এবং ফসটক্সিন টেবলেট ব্যবহারের ১ সপ্তাহের মধ্যে এবং এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ৩ সপ্তাহের মধ্যে পুকুরে মাছ ছাড়া যাবে না। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের পুকুরে এড্রিন বা এ জাতীয় রাসায়নিক দেয়া যাবে না। তবে ব্লিচিং পাউডার দিলে ৫-৭ দিন পরে মাছ ছাড়া যায়। রোটেনন ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার (হালকা বাদামি রং)। মাছ মারা যায় কিন্তু চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মারা যায় না। ৯.১% এবং ৭% শক্তি সম্পন্ন রোটেনন বাজারে পাওয়া যায়। রোটেননের মাত্রা নির্ভর করে তার শক্তির উপর।

রোটেনন ব্যবহার পদ্ধতি:

প্রয়োজনীয় রোটেননকে ৩ ভাগ করে, এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল তৈরি করতে হবে এবং বাকী দুই ভাগ প্রয়োজনীয় পানি মিশিয়ে তরলীকৃত করে ব্যবহার করতে হবে। ৩০-৩৫ মিনিট পর মাছ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টানতে হবে। প্রয়োগের ১ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মাছ ভেসে উঠবে। রোটেননের কার্যকারিতা প্রয়োগের ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে পানিতে বিদ্যমান থাকে। রোটেনন ব্যবহারে সতর্কতা:

- ব্যবহারের পূর্বে নাক মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- মেঘলা কিংবা বৃষ্টির দিনে রোটেনন ব্যবহার করা যাবে না।

পুকুরে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাত্রা এবং শর্তাবলী

- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য সূর্যালোকিত দিনকে বেছে নিতে হবে কারণ বিষক্রিয়া সরাসরি পানির তামাত্রার সাথে সম্পর্কিত। তাই মেঘলা দিনে পুকুরে বিষ প্রয়োগ উচিৎ নয়।

- পুকুরে পানি কম থাকলে এসব রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ লাভজনক। কারণ, রাসায়নিক দ্রব্য তখন কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় এবং বিষক্রিয়া সঠিকভাবে কার্যকরী হয়।
- চা বীজের খৈল পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। এ খৈলের মাত্রা ১০-২৫ পিপিএম (যা পানির ক্ষরতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়) অন্যান্য বিষের তুলনায় এটা ভালো। কারণ এটার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- রোটেনন ডেরিস নামক এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে আহরিত পাউডার যা জলজ প্রাণীকে শ্বাস রোধ করে মারে। রোটেননে মারা এসব মাছ খাওয়া নিরাপদ। রোটেনন (৯%) হলে, মাত্রা ২-৫ পিপিএম (পানির ক্ষরতার উপর ভিত্তি করে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়)।
- ফসটক্সিন প্রতি শতাংশ পানির জন্য ১৬০ গ্রাম অথবা ৩-৫ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে প্রতি ৭-৮ ফুট গভীরতার জন্য।
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ পদ্ধতি: রোটেনন, ফসটক্সিন অথবা চা বীজের খৈল পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং পানির উপরের অংশে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- দলীয় চাষীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অন্য যে কোন ভালো কার্যকারী পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৬) চুন প্রয়োগ

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পরে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানি মাছ চাষের জন্য আদর্শ রাখতে তথা মাছের বসবাসের জন্য পরিবেশ উপযোগী রাখতে এবং মাছকে রোগমুক্ত রাখতে পুকুরে অবশ্যই নিয়মিতভাবে চুন বা এজাতীয় উপকরণ প্রয়োগ করতে হয়।



চিত্র- ৩.১৬ পুকুরে ব্যবহৃত চুন

(ক) পুকুরে চুন দেয়ার প্রয়োজনীয়তা:

- পানির ঘোলাত্ব দূর করার জন্য।
- পানির P^H এর উঠানামা বন্ধ করার জন্যে।
- মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর করে P^H ৬.৫ থেকে ৮.২ এর মধ্যে রাখার জন্য।
- ক্ষতিকর গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

২০২৫

- অনিষ্টকারী পোকা মাকড়/ জীবাণু মারার জন্য যা রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।
- পুকুরের তলায় অত্যাবশ্যক মৌলিক খাদ্য উপাদান নিঃস্বরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য।
- চুন পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতার সূচক নিয়ন্ত্রণ করে।
- পানিতে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করার মাধ্যমে মাছের হাড় ও চিংড়ির খোলস তৈরিতে সাহায্য করে।
- চুন প্রয়োগের ফলে সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) চুনের গুণাগুণ ও প্রয়োগ মাত্রা :

- পাথুরে চুন (ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$) শুকানো অথবা পরিষ্কার পুকুরে ব্যবহার করতে হবে।
- পুকুরে সব সময় পাথুরে চুনের দলা যা পানিতে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম ধোয়া উঠে ঐ চুন ব্যবহার করতেই হবে। ভেজা অথবা গুড়া চুন ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- পানি এবং মাটির P^H এর উপর নির্ভর করে চুনের পরিমাণ নির্ধারিণ করতে হবে যেন পানির P^H ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকে। পানি অম্লীয় হলে চুন বেশী লাগবে।
- সাধারণতঃ কাদা এবং বালুযুক্ত মাটির জন্য প্রতি শতাংশে ১ কেজি এবং লাল মাটির জন্য ১.৫ কেজি চুন পুকুর প্রস্তুতির সময় দিতে হবে। শীতের শুরুতে মাছের রোগ প্রতিরোধের জন্য আরো ১ কেজি (দুইবারে আধা কেজি হারে দুইমাসে) চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- দোঁ আশ এবং বেলে মাটিতে চুন কম লাগে অপরদিকে লাল ও অম্লীয় মাটিতে চুন বেশী লাগে।

(গ) চুন প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়, যেমন- পাথুরে চুন, কলি চুন, পোড়া চুন, ডলো চুন ইত্যাদি। বর্তমানে বাজারে ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ ভালো চুন পাওয়া যায় যা তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং অধিক কার্যকারী। শুষ্ক পুকুর ও পানি ভর্তি পুকুরে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

শুকনো পুকুরে চুন প্রয়োগঃ পুকুর যদি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় অথবা নতুন করে পুকুর খনন করা হয় তাহলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন ভালভাবে গুড়া করে যখন বাতাস থাকবে না তখন বকচর সহ সমস্ত পুকুরের শুষ্ক তলদেশে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর পরে লাঙ্গল দ্বারা চাষ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চুন গুড়া করতে অসুবিধা হলে চুনকে শক্ত মাটির উপর রেখে অল্প পরিমাণে পানি ছিটিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে চুন গুড়া হয়ে যাবে তখন গুড়া চুন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।



চিত্র- ৩.১৭ পুকুরে চুন প্রয়োগ পদ্ধতি

পানি ভর্তি পুকুরে চুন প্রয়োগঃ পুকুর যদি শুকনো না হয় অর্থাৎ পানি ভর্তি পুকুরে যদি চুন প্রয়োগ করতে হয় অথবা মাছচাষ চলমান অবস্থায় পুকুরে চুন দেয়ার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন সুবিধাজনক কোন পাত্র যেমন- স্টিলের বালতি বা হাফ ড্রামে কিংবা ইউরিয়া বা টিএসপির প্লাস্টিকের খালি বস্তায় অর্ধেক পরিমাণ চুন দ্বারা ভর্তি করে বস্তার শেষ প্রান্তে রশি দ্বারা মুখ বেঁধে বড় পুকুর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি (কমপক্ষে ৩ ফুট) থাকলে সে পুকুরে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে। পরে চুন ভিজে ঠাণ্ডা হলে তা গুলে নিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে বকচর সহ সমস্ত পুকুরে বিকেলে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বড় পুকুরে নৌকা বা কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, মাছ ভর্তি পুকুরে কোন অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চুন প্রয়োগ করা যাবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল প্রথমে ৫০০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করে ৭ দিন পরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগের পরেও যদি পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে আবারও শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে পুকুরে একবার চুন প্রয়োগ করে বন্ধ রাখা উচিত নয়। বরং প্রতি ৩ মাস অন্তর সার প্রয়োগের অন্তত ৭ দিন আগে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।



চিত্র- ৩.১৮ পুকুরের পানিতে চুন প্রয়োগ

লক্ষ্যণীয়:

- পুকুর প্রস্তুতির সময় ঝোপ- জঙ্গল, মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর চুন দিতে হবে।
- সাধারণতঃ পাকা বাড়ী চুন কাম করার জন্য যে পাথর চুন ব্যবহার করা হয় সেই চুনই পুকুর প্রস্তুতির সময়, বিষ প্রয়োগ করলে তার ৫-৭ দিন পর শতাংশ প্রতি এক কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- মাটির পাত্র, লোহার ড্রাম অথবা পুকুর পাড়ে পানির কাছাকাছি গর্ত খনন (২×২×২ ঘনফুট) করার পর সেখানে পানি ভর্তি করে, পানিতে চুন দিতে হবে।
- ভেজা চুন ঠান্ডা হলে, পাতলা দ্রবণ তৈরি করে পুকুরের পানির উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। শুকনো পুকুরের ক্ষেত্রে চুন পুকুরের তলা এবং পুকুর পাড়ে যতদূর পানি উঠে ততদূর পর্যন্ত ছিটিয়ে দিতে হবে।
- চুন যে পাত্রে ভোজানো হবে, ঐ পাত্র পুকুরের পানিতে দুই তৃতীয়াংশ ডুবিয়ে ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন।
- নতুন পুকুরে চুন দেয়ার পূর্বে তলার মাটি চাষ করে নিতে হবে।

সর্তকতা :

- পোড়া চুন অত্যন্ত ক্ষারীয় (কষ্টিক), এটি ব্যবহার পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়। পুকুর শুকানো অবস্থায় তা ব্যবহার করা নিরাপদ।
- পানির ক্ষারত্ব ও খরতা প্রতি লিটারে ২০ মি. গ্রাম এ নীচে এবং পিএইচ যদি ৭ এর কম থাকে তবে পুকুরে পাথুরে চুন ব্যবহার করতে হয়।
- পানিতে চুন গুলাতে টিনের বালতি, ড্রাম অথবা সিমেন্টের পাত্র ব্যবহার করতে হবে।
- প্লাষ্টিক বালতি ব্যবহার করা যাবে না, কারণ চুন ভিজালে তাপ উৎপন্ন হয়।
- বাতাসের অনুকূলে পুকুরে চুন ছিটাতে হবে।
- পুকুরে চুন প্রয়োগের সময় মুখে কাপড় / গামছা বেধে এবং হাতে পলিথিন পেচিয়ে নিতে হবে।
- কড়া রোদে চুন বেশী কার্যকর। পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় চুন দিতে হলে তা অবশ্যই পানিতে গুলে ঠান্ডা করে নিতে হবে।
- চুন বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

(৭) সার প্রয়োগ

সার হচ্ছে একটি পদার্থ, যার মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশকীয় পুষ্টি উপাদানের যে কোনো একটি অন্তত বিদ্যমান থাকে। যেমন-ইউরিয়া, ডিএপি, কম্পোষ্ট ইত্যাদি। পরোক্ষভাবে মাছের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করার জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরের পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভিদ ও প্রাণিকনা বৃদ্ধি পায়। ফলে পুকুরে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ তাদের আমিষ চাহিদার ৪০-৭০% পূরণ করতে পারে। কার্পজাতীয় মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য হচ্ছে প্ল্যাংকটন।

প্লাংকটন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, পুকুরের তলার কীট প্রভৃতি মাছের প্রিয় খাদ্য। এসকল প্লাংকটন ও জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য পুকুরে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিকারক উপাদান সরবরাহ করতে হয়। পুষ্টিকারক উপাদানসমূহের মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব পদার্থ বাজারে সরাসরি পাওয়া যায় না। তবে বাণিজ্যিকভাবে দু'ধরণের যৌগের আকারে সার হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন- জৈব সার ও অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার: জীবদেহ হতে প্রাপ্ত সারকে জৈব সার বলে। যেমন- গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতি।

অজৈব বা রাসায়নিক সার: সুনির্দিষ্ট উপাদান সমৃদ্ধ যেসব সার কৃত্রিম উপায়ে কারখানাতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তাদেরকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ ইত্যাদি। পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

- মাটির অবস্থা
- পানির মধ্যকার শ্যাওলার পুষ্টি চাহিদা
- পরিবেশের ভারসাম্য
- সারের গুণাগুণ, এবং
- মাছের ঘনত্ব।

সার প্রয়োগের উপকারীতা: পুকুরে সার প্রয়োগ করলে নিম্নলিখিত উপকার পাওয়া যায়। যেমন-

- সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হয়। এসব পুষ্টি উপাদানসমূহ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে
- পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। ফলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়
- সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়
- জৈব সার বিশেষ করে গোবরে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। পুকুরে ইহা ব্যবহার করলে এ আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়াও রুই ও তেলাপিয়া মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, এবং
- পরিশেষে অল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

সার প্রয়োগের মাত্রা: কোন ধরণের পুকুরে কোন জাতীয় সার কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে তা অভিজ্ঞতার আলোকেই ঠিক করে নিতে হবে। তবে একজন দক্ষ মৎস্যচাষি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পানির বর্ণ বা রং দেখেই বলে দিতে পারেন তার পুকুরের জন্য কতটুকু সার প্রয়োজন। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় মাছচাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতকালীন এবং মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সার প্রয়োগের মাত্রাঃ

পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ		মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ		
সারের নাম	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ
	প্রতি শতাংশে	শতাংশ/দিন	শতাংশ/সপ্তাহ	বিঘা/দিন
গোবর অথবা	১০ কেজি	২০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৭ কেজি
মুরগির বিষ্টা অথবা	৫ কেজি	১০০ গ্রাম	৭০০ গ্রাম	৩.৫ কেজি
কম্পোষ্ট	১০ কেজি	২০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৭ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম	৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫ গ্রাম	৩ গ্রাম	২১ গ্রাম	১০০ গ্রাম



চিত্র- ৩.১৯ বিভিন্ন প্রকারের সার

সার প্রয়োগের পদ্ধতি: উল্লেখিত পরিমাণ সার দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক কিস্তিতে শুকনো অথবা পানি ভরা পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুর যদি শুকনো হয় তাহলে পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে নিম্ন লিখিতভাবে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শুকনো পুকুরে সার প্রয়োগ: পুকুর যদি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় অথবা নতুন করে পুকুর খনন করা হয় তাহলে সে সব পুকুরের শুষ্ক তলদেশে শতাংশ প্রতি ১০ কেজি গোবর অথবা ৫ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের পরপরই সম্ভব হলে কমপক্ষে ১ ফুট পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে জৈব সার পচে মৌলিক উপাদানসমূহ পানিতে মিশতে পারবে এবং পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। এর পরে আস্তে আস্তে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে পোনা মজুদের ৭ দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাসায়নিক সার (ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম/শতাংশ এবং টিএসপি ৭৫ গ্রাম/শতাংশ) পানিতে গুলে প্রখর সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভরা পুকুরে সার প্রয়োগ: মাটির চাড়িতে অথবা প্লাস্টিক ড্রামে জৈব সার ও টিএসপি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে একরাত ভিজিয়ে প্রয়োগের আগে ইউরিয়া মিশিয়ে পাতলা করে সমানভাবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ভাল ফল পেতে হলে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন পুকুরে উল্লেখিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২০২৫



চিত্র- ৩.২০ পুকুরে সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগে সতর্কতা:

- পুকুরে আগাছা থাকলে সারের কার্যকারীতা কমে যায়
- পুকুরে পানির স্থায়িত্ব কম হলেও সারের কার্যকারীতা কমে যাবে
- মেঘলা দিনে অথবা বৃষ্টির মধ্যে সারের ব্যবহার খুব কার্যকর নয়, এবং
- চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করা উচিত।

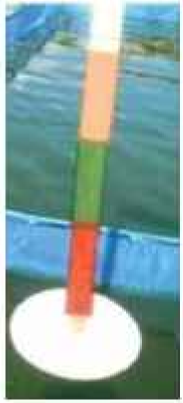
(৮) পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সার দেওয়ার ৫-৭ দিন পরে পকুরের পানি পরীক্ষা করতে হবে। যদি হালকা সবুজ কিংবা বাদামী সবুজ হয় তবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হয়েছে। এবং এখন মাছ ছাড়ার উপযোগী হয়েছে। পুকুরের প্রাকৃতিক খাবার বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করা যায়:

(ক) সেক্কিডিস্কের মাধ্যমে :

সেক্কিডিস্ক একটি লোহার থালা। এর ব্যাস ২০ সেমি রঙ সাদা-কালো। এটি ৩ রঙের প্লাস্টিকের সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। গোড়া থেকে প্রথম সুতার রঙ লাল ২০ সেন্টিমিটার, দ্বিতীয় সুতার রঙ সবুজ ১০ সেন্টিমিটার এবং হাতে ধরার সর্বশেষ সুতার রঙ সাদা বা অন্য যে কোন রঙের ১০০-১২০ সেন্টিমিটার।

লাল সুতা: দিনের বেলার সকাল ১০-১১ টার মধ্যে সেক্কিডিস্ক দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে। পানিতে লাল সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর থালার সাদা অংশ দেখা না গেলে বোঝাতে হবে পুকুরে অতিরিক্ত খাদ্য আছে। তবে পানি ঘোলা থাকলেও এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় রেণু ছাড়া, সার ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা ঠিক নয়।



চিত্র- ৩.২১ সেক্কিডিস্ক

(খ) হাত দ্বারা প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা :

সূর্যালোকিত দিনের বেলায় সকাল ১০-১২ টার মধ্যে পরীক্ষা করতে হবে। হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে হাতের তালু দেখুন, যদি তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে খাবার আছে। আর যদি তালু দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে খাবার নেই। এবং খাবারের জন্য সার প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র- ৩.২২ হাতের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

(গ) স্বচ্ছ কাচের গ্লাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা :

প্রথমে গ্লাসের মধ্যে পুকুরের পানি নিয়ে দেখুন। যদি ৮-১০টি প্রাণিকনা দেখা যায় তবে বুঝা যাবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে। এর চেয়ে কম সংখ্যক দেখা দিলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার কম আছে এবং সার প্রয়োগ করতে হবে। রঙ্গিন ও ছাপা গ্লাস উপেক্ষা করতে হবে। এতে সূর্যের আলো প্রবেশ না করতে পারায় প্রাণিকনা দেখা যাবে না। তাছাড়া ঘোলা পানি নিয়ে পরীক্ষা করলেও ফল পাওয়া যাবে না।



চিত্র- ৩.২৩ গ্লাসের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

(৯) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

যে পুকুরের পানিতে মৎস্যভূক ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন পাউডার কিংবা টেবলেট কিংবা অন্যান্য কোন বিষ দেয়া হয়েছিল শুধু সেই পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার প্রয়োজন। যে পুকুরে কোন পাউডার কিংবা বিষ দেওয়া হয়নি সে পুকুরে বিষাক্ততা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। বিষক্রিয়া পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পুকুর হতে এক বালতি পানি নিয়ে পোনা ছাড়ার ঠিক ২-৩ দিন পূর্বে তার মধ্যে ৪/৫টি সুস্থ সবল পোনা ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টায় যদি পোনা মারা না যায় তাহলে বোঝতে হবে পুকুরে বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে জলায়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা মজুদকালীন কাজসমূহ

পোনা মজুদকালীন সময়ে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাকে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা বলে। এক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি পালন করতে হয় তা হলো:

(১) প্রজাতি নির্বাচন: প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষিকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

- চাষকৃত প্রজাতিকে অবশ্যই দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে
- মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রজাতি গুলোর পোনা যেন নিজ এলাকায় অথবা এলাকার কাছাকাছি পাওয়া যায়
- চাষকৃত প্রজাতি যেন একে অন্যের সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা না করে
- চাষকৃত প্রজাতিগুলোর স্বভাব যেন মৎস্যভুক না হয়
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় এমন বৈশিষ্ট্যাবলী থাকলে ভাল হয়

- উৎপাদিত মাছের এলাকাগত চাহিদা এবং বাজারমূল্য যেন ভাল হয়, এবং
- পরিশেষে নির্বাচিত প্রজাতিটির চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেন সহজ হয়।

(২) পোনার পরিমাণ নির্ধারণ: মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত জাত বা প্রজাতির পোনার মধ্যে কোনটি কত সংখ্যায় মজুদ করা যেতে পারে তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে।

চাষ পদ্ধতি: কোন পুকুর বা জলাশয়ে মাছ চাষের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ঐ পুকুরে কী পরিমাণে পোনা মজুদ করা হবে। ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে মাছচাষ পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি, আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি ও নিবিড় চাষ পদ্ধতি।

- **সম্প্রসারিত মাছ চাষ পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব সবচেয়ে কম। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর অর্থাৎ কোন প্রকার সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না। আমাদের দেশের অনেক পুকুর-দিঘি এখনও সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির আওতায় মাছ চাষ করা হয়ে থাকে।
- **আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির চেয়ে একটু বেশি। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কয়েক প্রজাতির মাছ একত্রে (মিশ্রচাষ) বা শুধু এক প্রজাতির মাছচাষ করা যায়। আমাদের দেশে এ পদ্ধতিতে মাছচাষ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
- **নিবিড় চাষ পদ্ধতি:** এ পদ্ধতি হচ্ছে আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি যেখানে মজুদ ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে। প্রাকৃতিক খাদ্যের ব্যবহার সবচেয়ে কম থাকে। সম্পূরক খাদ্যের ওপর মাছের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করা হয় যাতে অব্যবহৃত খাদ্য বেশি ঘনত্বে বসবাসকারী মাছের জন্য কোন ক্ষতি করতে না পারে। ব্যয়বহুল এ মাছচাষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে অনুকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত এক প্রজাতির মাছচাষ করা হয়। উল্লেখ্য আমাদের দেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছের চাষ এখনও তেমন প্রসার লাভ করেনি।

পুকুরের উৎপাদশীলতা ও চাষের জন্য প্রাপ্ত সময়: মাটি ও পানির গুণাগুণ অনুযায়ী পুকুরের উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন পুকুরে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- বেলে ও এঁটেল মাটির পুকুরের উৎপাদশীলতা দো-আঁশ মাটির পুকুরের চেয়ে কম। সুতরাং কম উৎপাদনশীল পুকুরের মজুদ ঘনত্ব কম রাখতে হয়। একইভাবে মৌসুমী পুকুর যেগুলো বছরের ৬-৭ মাস পানি থাকে এমন পুকুরের মজুদ ঘনত্ব সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুরের চেয়ে কম হয়ে থাকে।

উৎপন্ন মাছের আকার: মজুদ ঘনত্বের ওপর মাছের আকার নির্ভর করে। সম্প্রসারিত পদ্ধতিতে কম ঘনত্বে মাছ মজুদ করা হয় বলে মাছের আকার বড় হয়। পক্ষান্তরে নিবিড় পদ্ধতিতে বেশি ঘনত্বে মাছ মজুদ করা হয় বলে মাছের আকার তুলনামুলকভাবে ছোট হয়। সম্প্রসারিত পদ্ধতির চেয়ে নিবিড় পদ্ধতিতে মোট মাছের উৎপাদন বেশি হয়। সুতরাং বড় আকারের মাছ উৎপাদন করতে চাইলে কম ঘনত্বে মাছ মজুদ করতে হবে। তবে পোনা মজুদের আগে অবশ্যই পোনা ভাল না খারাপ তা শনাক্ত করতে হবে।

২০২৫

বাৎসরিক পুকুরে শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের নমুনা

প্রজাতির নাম	পোনার		চাষ পদ্ধতি	
	আকার (ইঞ্চি)	গড় ওজন (গ্রাম)	আধানিবিড়	সম্প্রসারিত
সিলভার কার্প	৪-৫	২০-৩০	১০	৪-৫
কাতলা	৪-৫	৪০-৫০	৫	৩-৪
রুই	৪-৬	৩০-৪০	৭	৪-৫
মৃগেল	৪-৬	৩০-৪০	৫	৩
কমন কার্প	৩-৪	৩০-৪০	২	২-৩
গ্রাসকার্প	৪-৬	৩০-৪০	৩	১-২
রাজপুঁটি	১-২	১০-১৫	১০	১
মোট			৪২	১৮-২৩

(৩) ভাল ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণ

মাছের পোনার প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব সম্পর্কে জানার পর পোনা কিভাবে চেনা যায় তা জানা দরকার। নিচের ছকে ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

পর্যবেক্ষণের বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
চলাফেরা	চঞ্চল	স্থির
আঁইশ	চকচকে	দাগযুক্ত
পাখনা	অক্ষত	ছেঁড়া, ভাঙ্গা
রঙ	উজ্জ্বল	বিবর্ণ
শরীরের দাগ	কোন দাগ নেই	গায়ে, পাখনায়, ফুলকায় দাগ থাকে
গোলাকার পাত্রে রেখে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

ভালো পোনা মজুদের সুবিধাসমূহ :

- দ্রুত বর্ধনশীল হবে,
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হবে,
- সহজলভ্য সম্পূরক খাদ্যে অভ্যস্ত হবে,
- মাছে বৃদ্ধি ও আকার সুষম এবং একই রকম হবে।

(৪) পোনা পরিবহন

পোনা পরিবহনের পূর্বে পোনার বিপাকক্রিয়া কমানো এবং অক্সিজেন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পোনার পেট খালি করা হয়। এজন্য পুকুর হতে মাছ ধরে কমপক্ষে ৪-৬ ঘণ্টা হাপায় রাখলে পোনার পেট খালি হবে তখন পরিবহনের সময় পাত্রের পানি নষ্ট হবে না। তা না হলে পোনা মল বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে পানির

গুনাগুণ নষ্ট করে। পোনা পরিবহনকারীদের ভাষায় পোনার পেট খালিকরণের এ পদ্ধতিকে পোনা পাকাকরণ বা টেকসইকরণ বলে। সঠিকভাবে পোনা পরিবহন মাছচাষে ভাল ফল লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যদি সঠিক নিয়মে পোনা পরিবহন করা না হয় তাহলে পোনার ওপর শরীরবৃত্তীয় বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে যা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পোনা মজুদের পর পোনা মৃত্যুর হারও অনেক বেড়ে যায়। পোনা পরিবহনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো পোনার আকার, প্রজাতি, পরিবহন স্থানের দূরত্ব এবং পরিবহন পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনা করা। নিচে পোনা পরিবহনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য এসব বিষয়সমূহ কি প্রভাব ফেলে তা হলো:

- ছোট পোনার চেয়ে বড় পোনার অক্সিজেন চাহিদা আনুপাতিক হারে অনেক কম (১ কেজি ছোট পোনা ১ কেজি বড় পোনার চেয়ে বেশি অক্সিজেন গ্রহণ করে) তাই পোনা পরিবহনের সময় বড় পোনার চেয়ে ছোট পোনার ঘনত্ব কম অথবা অক্সিজেন সরবরাহ বেশি হওয়া প্রয়োজন;
- সব প্রজাতির মাছের অক্সিজেন চাহিদা সমান নয়। যেমন- সিলভার কার্প এবং কাতলার অক্সিজেন চাহিদা অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশি। তাই সিলভার কার্প এবং কাতলার পরিবহন ঘনত্ব অন্যান্য মাছের চেয়ে কম হবে;
- অধিক দূরত্বে পোনা পরিবহন করতে হলে অক্সিজেন সম্বলিত পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহন সবচেয়ে উত্তম। দূরত্ব বেশি হলে পোনাকে টেকসইকরণ করে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা খাবার ছাড়া রেখে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর কম দূরত্বে পরিবহন করতে হলে জাল টেনে মাছ ধরে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা হাপায় রেখে পরে পরিবহন করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণত দু'ভাবে পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে।

(ক) সনাতন পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের হাড়িতে অথবা ড্রামে করে কাঁধে, বাইসাইকেলে বা ভ্যানে পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি সনাতন হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে রেণু পরিবহনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার খুবই কম। এ পদ্ধতিতে এ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা ড্রামের মাধ্যমে পোনা পরিবহন করতে হয়। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। টেকসই করণের পর পোনা পরিবহন উপযোগী হলে পরিমাণ মত নলকূপ/নদী/পুকুরের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি নিতে হবে। এ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ ২০-৩০টি পোনা/লিটার ঘনত্বে পরিবহন করা যায়।



চিত্র- ৩.২৪ সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন

এ পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন কালে পাতিল বা ড্রামে মুখ ভেজা পাতলা কাপড় বা মশারীর জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। অনেক সময় পাতিল বা ড্রামের পানিতে হাত দিয়ে বা ঝাঁকিয়ে বাতাসের অক্সিজেন মিশাতে হয় এবং ৪/৫ ঘন্টা পর পর পানি বদলাতে হয়। পোনা পরিবহনকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ড্রাম বা পাতিলের পানি অত্যাধিক গরম না হয়।

(খ) আধুনিক পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে পানি এবং অক্সিজেন সহ পোনাকে প্যাকেট করে পরিবহন করা হয় সাধারণত বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৬৬-৪৬ সেমি. আকারের পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহন করা হয়। প্রতিটি প্যাকেটে ২টি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করাই উত্তম। কোন কারণে যদি একটি ব্যাগ ছিদ্র হয়ে যায় তবে দ্বিতীয়টি পানি, অক্সিজেন ও পোনা রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

পোনা প্যাকিং করার সময় সমান আকারের দুটি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে একটি অন্যটির ভিতর ঢুকিয়ে তার ১/৩ অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং ব্যাগের উপরের অংশ এক হাত দিয়ে আটকিয়ে এবং অন্য হাত দিয়ে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে কোন ছিদ্র পথে পানি বেরিয়ে যায় কিনা। ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে। পরিবহনকালে পলিথিন ব্যাগ যাতে ছিদ্র হতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে পলিথিন ব্যাগ বস্তায় ভরে পরিবহন করতে হবে।



চিত্র- ৩.২৫ আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন

পোনা পরিবহনে সতর্কতা:

- পোনা পরিবহনের সময় পাত্রের পানি গরম হয়ে গেলে প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম বরফ যোগ করে পানির তাপমাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে
- .অধিক দূরত্বে পোনা পরিবহন করতে হলে চেতনানাশক ব্যবহার করে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ড্রাই আইস (শুষ্ক কার্বন ডাই-অক্সাইড), এম.এস-২২২, কুইনালডিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকতে হবে। অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে সমস্ত পোনাই মারা যেতে পারে
- প্রয়োজনীয় পোনা পানিসহ পলিথিন ব্যাগে রেখে পলিথিনের বাকী অংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করে সুতলি/রাবার ব্যান্ড দিয়ে ভাল ভাবে বেঁধে নিতে হবে যাতে অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে না পারে। পোনা পরিবহণের জন্য পানির তাপমাত্রা ২২-২৭° সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখা উচিত। পানির তাপমাত্রা বেশি হলে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যায়

- একটি পাতিলে বা ড্রামে/ট্যাংকে/ব্যাগে একই আকারের পোনা পরিবহন করা উচিত
- পোনা পরিবহন করার আগে পোনাকে পেট খালি করে কন্ডিশনিং করে নিতে হবে
- দুর্বল পোনা পরিবহন করা যাবে না
- পরিবহনকালে সরাসরি নলকূপের পানি ব্যাগে/পাতিলে/ড্রামে/ট্যাংকে দেয়া উচিত নয়। এতে পোনা মারা যেতে পারে
- প্রয়োজন হলে একই তাপমাত্রার ভাল পানি দিয়ে ব্যাগের বা পরিবহন পাত্রের পানি বদলানো যেতে পারে
- ব্যাগে পরিবহন করে পোনাকে অবশ্যই শোধন করে পুকুরে ছাড়তে হবে এবং কম পরিমাণ পোনা এক সাথে পরিবহন করতে হবে
- লোহার/প্লেনসিটের ড্রামের পরিবর্তে প্লাষ্টিক ড্রামে পোনা পরিবহন করাই ভাল। তাতে ক্ষতি কম হয়

৫. পোনা শোধন:

পোনা পরিবহন করে খামারে নেওয়ার পর পুকুরে ছাড়ার পূর্বে পোনা শোধন করে নিতে হবে এবং এতে পোনা সুস্থ থাকবে এবং রোগ বালাই এর সম্ভাবনা কমে যাবে। পোনা নিম্নরূপভাবে শোধন করা যাবে:

- একটি বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে এর মধ্যে ২০০ গ্রাম খাবার লবণ অথবা ১ চা চামচ ডাক্তারি পটাশ ($KMnO_4$) মিশাতে হবে
- অতঃপর বালতির উপর একটি ঘন জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২০০-৩০০টি পোনা ছাড়তে হবে
- তারপর জাল ধরে পোনা গুলোকে বালতির পানিতে ৩০ সেকেন্ড গোসল করাতে হবে
- এভাবে একবার তৈরি করা লবণ/পটাশের পানিতে ৫-৭ বার শোধন করা যাবে

৬. পোনা অভ্যস্তকরণ:

মাছ চাষের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধাপের ন্যায় পোনা অভ্যস্তকরণ ধাপটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছ একটি চঞ্চল (Rest less) প্রাণী। যখন সে পুকুরে অবস্থান করে তখন সে একটি বিশাল পরিবেশকে ব্যবহার করে। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন কোন মাছকে পুকুর হতে তুলে হাড়িতে বা ড্রামে করে পরিবহন করা হয়। তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে পারিবেশিক বিরূপ চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে অনেক মাছ পরিবহনের সময়ই মারা যায় বা অনেকেই মুমূর্ষু অবস্থায় পুকুর পর্যন্ত পৌছে। এভাবে পরিবহনকৃত মাছকে পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত না করে অনেকেই তাৎক্ষনিকভাবে পুকুরে ছেড়ে থাকেন। ফলে অর্ধেক পোনাই নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে মারা যায়। ছোট পোনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে রেণুপোনার ক্ষেত্রে এ মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। তাই পোনা অবমুক্তকরণের পূর্বে অবশ্যই পোনা অভ্যস্তকরণ করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে।



চিত্র- ৩.২৬ পোনা অভ্যস্তকরণ

৭. পোনা অবমুক্তকরণ:

এমনিভাবে পরিবহনকৃত পোনা প্রজাতিভিত্তিক সঠিকভাবে গুণে নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে -

- পলিথিন ব্যাগে/হাঁড়িতে পোনা পরিবহন করলে সেই ব্যাগ/হাঁড়ি পুকুরের পানিতে বেশ কিছুক্ষণ ভাসিয়ে রেখে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে
- তারপর ব্যাগের মুখ/হাঁড়ির মুখ খুলে দিয়ে নিজের হাত বা থার্মোমিটার দিয়ে পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান দেখতে হবে
- তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের কিছু পানি পুকুরে এবং পুকুরের কিছু পানি পাত্রে নিতে হবে
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে ব্যাগটি পুকুরের দিকে কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে, এবং
- মৃদু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (সকাল/বিকাল) পোনা ছাড়া ভাল। দুপুরের কড়া রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়।



চিত্র- ৩.২৭ পোনা অবমুক্তকরণ

৩.৪ পোনা মজুদ পরবর্তী কাজসমূহ

পোনা মজুদের পরে যেসব ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বলে। এক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে তা হলো-

১. পোনা বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ: পুকুরে পোনা ছাড়ার কয়েক ঘন্টা পর (৬-১২ ঘন্টা) পাড়ের কাছে বা পানির উপর চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কোন পোনা মারা গেল কিনা দেখা দরকার। পোনা মারা গেলে ভেসে উঠবে বা পাড়ের কাছাকাছি ভেসে থাকবে। যদি বেশি পোনা মারা যায় তাহলে সমসংখ্যক পোনা আবার পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ: অন্যান্য প্রাণীর মত মাছকেও বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য পরিমিত পরিমাণ সুষম পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সুষম পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া মাছের দ্রুত বৃদ্ধি তথা সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। পুকুরে মাছের যে প্রাকৃতিক খাবার থাকে তা মাছচাষে অধিক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই মাছের অধিক উৎপাদন পেতে হলে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি: সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রস্তুতের সময় খাদ্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের গুণগতমান, সহজলভ্যতা ও বাজারদরকে প্রাধান্য দিতে হয়। কেননা প্রস্তুতকৃত খাদ্যের গুণগতমান ভাল রেখে বাজার মূল্য যত কম হবে মাছের উৎপাদন খরচ তত কম হবে। সাধারণত মাছের দেহ বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে ৩০% এর বেশি আমিষের প্রয়োজন হয় না।

খাদ্যোপাদানের নাম	আমিষ (%)	শর্করা(%)	চর্বি (%)	আঁশ (%)	খনিজ পদার্থ (%)
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৭৮	১৩.৪৪	৭.১	১৫.৩
চালের মিহি কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫	১৪.১	১১.৫
চালের মোটা কুঁড়া	৬.২	৩৭.৮	২.৭	৩৩.১	১০.৭

গমের ভুষি (চিকন)	১৫.০	৫৪.১	৪.৪৩	৭.৫	৫.৩
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬	৩.৯০	০.৯	১.২
ফিশমিল-এ গ্রেড	৫৬.৬১	১১.২২	৩.৭৪	৪.২	৬.৫
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	২.০	১.০	১.২

উৎস ঃ মৎস্য ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা- বিষ্ণুদাস

খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ: মজুদকৃত মাছের জন্য কতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তা জানার জন্য অবশ্যই পুকুরের মজুদকৃত মাছের মোট জীবভর বের করতে হবে। জীবভর বলতে ইকোসিস্টেমের একটি নির্দিষ্ট এলাকায়, নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক জায়গায় যে পরিমাণ জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে বুঝায়। যেমন-কোন একটি পুকুরে যে পরিমাণ মাছ ও অন্যান্য জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে ঐ পুকুরের জীবভর বলে। জীবভর বের করার জন্য প্রথমেই মজুদকৃত মাছের গড় ওজন বের করে সেই গড় ওজনকে মজুদকৃত মাছের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে মোট জীবভর (Biomass) পাওয়া যাবে। সেই মোট জীবভরকে শতকরা হার (%) দিয়ে গুণ করলে প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যাবে। সাধারণত মাছের ওজনের ৩ থেকে ৫ % হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দিনে ২ বার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী :

পরিমাণ মত খাদ্য উপাদান গ্রাইন্ডারে ভাল করে চূর্ণ বা গুড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে ছেলে নিতে হবে। এর পর ফর্মূলা অনুযায়ী উপাদানসমূহ একটি একটি করে নির্দিষ্ট মাত্রায় মেপে নিতে হবে এবং অল্প অল্প করে মিক্সার মেশিনে বা বড় একটি পাত্রে ঢেলে হাত কিংবা কাঠি দিয়ে শুকনা অবস্থায় ভালভাবে মিশাতে হবে। মিশানোর সময় সবচেয়ে কম খাদ্য উপাদানসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি খাদ্যের সাথে মিশাতে হবে। এভাবে মেশানোর পর অল্প অল্প করে পানি এমনভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো পেষ্ট বা মন্ডে পরিণত হয়। বাইন্ডার হিসেবে চিটাগুড় ব্যবহার করলে চিটাগুড়কে প্রথমে পানিতে মিশিয়ে পাতলা করে উপরে বর্ণিত খাদ্যের সাথে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করতে হবে। এ মন্ড ভেজা খাদ্য হিসেবে গোলাকৃতির বল আকার বানিয়ে সরাসরি মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে ।



চিত্র- ৩.২৮ পানিতে প্রয়োগের পূর্বে তৈরিকৃত বল

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পুকুরের বিভিন্ন জায়গার একটি নির্দিষ্ট স্থানে, প্রতিদিন একই সময়ে, একই সাথে কমপক্ষে ২ বার পানির ৩ ফুট নিচে খাদ্যদানি সেট করে সেই খাদ্যদানিতে খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে। তবে পাংগাস এবং তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে খাদ্যদানিতে খাদ্য না দিলেও চলবে। সেক্ষেত্রে সরাসরি মাটিতে খাদ্য প্রয়োগ করলে অল্প দিনের মধ্যেই খাদ্য গ্রহণের সময় মাছের পাখনার ঘর্ষনে ঐ স্থানের কাদা মাটি সরে গিয়ে শক্ত তলা বের হবে যা খাদ্যদানির বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

৩. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ: পুকুরে পোনা মাছ মজুদের পর সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জৈবসার যেমন- গোবর প্রতি ১৫ দিন পর পর ১ কেজি অথবা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ৫০০ গ্রাম হারে পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ৪০ গ্রাম ও টিএসপি ২০ গ্রাম হারে একটি পাত্রে ৩০ গুণ পানির সাথে মিশিয়ে অন্তত ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে রোদের সময় গোলানো সার সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুকুরের পানি যদি অত্যধিক সবুজ রঙ ধারণ করে তাহলে সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। মেঘলা ও বৃষ্টির দিনে সার প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ: মাসে একবার জাল টেনে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫. পুকুরে মাছের পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- ভোরে অক্সিজেন স্বল্পতার অভাবে মাছ খাবি খেলে পাতিল দিয়ে পানিতে ঢেউ দিতে হবে। অথবা সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পানিতে অক্সিজেন মিশে যায়
- ইউগ্লিনা প্রজাতির প্ল্যাংকটন দিয়ে পুকুরের পানির উপরে লাল সর পড়লে খড়ের রশি টেনে তা তুলে ফেলতে হবে অথবা ইউরিয়া সারের ঘন দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে
- পুকুরের মাটিতে বিষাক্ত গ্যাস জমা হলে হড়রা টানতে হবে। অথবা প্রয়োজনীয় মাত্রায় গ্যাস নিরোধক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে এবং
- খারাপ আবহাওয়ায় ও শীতের সময় মাছকে কম খাদ্য দিতে হবে।

৬. আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদকরণ:

লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে হলে আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ কৌশল অবলম্বন করা দরকার। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রথম কয়েক মাসে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সিলভার কার্প, কাতলা, গ্রাসকার্প প্রভৃতি। ভাল বাজার মূল্য থাকলে ৫০০-৬০০ গ্রাম ওজনের সিলভার কার্প ও কাতলা, ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের রুই ও মৃগেল আহরণ করে বিক্রি করা ভাল। মাছ বয়ঃ প্রাপ্ত হবার পর তাদের দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুততর হয় না। ফলে নির্দিষ্ট বয়সের পরে পুকুরে প্রতিপালন করার প্রয়োজন নেই। কাজেই পুকুরে বড় মাছ রাখা হলে অধিক লাভ পাওয়া যায় না।

তাই বাজারজাতকরণ উপযোগী মাছ ধরে ফেলতে হয়। এছাড়া পুকুরে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার অধিক মাছ মজুদ রাখা হলে ছোট মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। তাই পুকুর থেকে নিয়মিত বড় মাছ ধরে ছোট মাছকে বড় হবার সুযোগ করে দিতে হবে। বড় মাছ ধরে ফেললে পুকুরে বেশি জায়গা হওয়াতে ছোট মাছগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। এ সব সুবিধার কারণে আংশিক মৎস্য আহরণ করা হয়। তবে একমাসে যে কয়টি মাছ

আহরণ করা হবে, সমান সংখ্যক ঐ প্রজাতির মাছের পোনা পুকুরে মজুদ করতে হবে। এভাবে আহরণ ও মজুদের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করলে অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।



চিত্র-৩. ২৯ পুকুর থেকে আংশিক মাছ আহরণ

৭. রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা: মাছ জলজ প্রাণী বিধায় মৃত্যু থেকে শুরু করে এর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং জলীয় পরিবেশে পানির অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। তাই ব্যাপক ধরণের কোন রোগব্যাধী দেখা না দিলে অনেকাংশেই তা মৎস্যচাষির গোচরে আসে না। যখন মৎস্যচাষির গোচরে আসে তখন অনেক ক্ষেত্রেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই মাছচাষের ক্ষেত্রে কথায় বলে 'রোগের চিকিৎসা নয়, রোগের প্রতিরোধ বা রোগ সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং আগে থেকেই তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া'। নিচে রোগ প্রতিরোধে করণীয় পদক্ষেপসমূহ দেয়া হলো।

- শীত শুরুর আগেই পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে
- মজুত ঘনত্ব বেশি হলে আংশিক আহরণের মাধ্যমে ঘনত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে
- সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে এবং
- পুকুরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৮. রোগাক্রান্ত মাছের চিকিৎসা: মাছচাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও যদি রোগ হয়েই যায় তাহলে অবশ্যই রোগাক্রান্ত মাছের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সেই রোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় বা সনাক্তকরা (Disease diagnosis)। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে রোগ নির্ণয় সম্ভব না হলে আক্রান্ত মাছের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করে কোন ধরণের সংক্রমণ হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে সেই ধরণের নির্দিষ্ট চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

৯. মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ: পুকুর হতে মাছ ধরার পূর্বের দিন পুকুরে অবশ্যই জাল টানতে হবে এবং সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এতে মাছ পাকা হবে অর্থাৎ মাছের দেহ শক্ত হবে। কারণ মাছের

২০২৫

পেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য থাকলে জীবিত অবস্থায় যে এনজাইম খাদ্য হজমে সহায়তা করতো ঠিক সেই এনজাইম এবং পঁচনকারী ব্যাকটেরিয়া মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাছকে পঁচাতে সহায়তা করবে।

সঠিক বাজার মূল্য প্রাপ্তির নিমিত্তে মৎস্যচাষিকে অবশ্যই উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তবে পাংগাসের ক্ষেত্রে একদম খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার অনেকেই বিশেষ করে পুকুরে মাছ যখন কমে যায় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে পুকুর হতে মাছ ধরার সময় মাছকে ধরে বেশ কিছু সময়ের জন্য হাপাতে রাখেন। এমন কি কখনও কখনও প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা মাছকে এভাবে রাখা হয়। মাছকে এভাবে হাপায় রাখলে পালানোর জন্য মাছ অবিরাম চেষ্টা করে। এ কারণে এভাবে রাখা মাছের ক্ষেত্রে মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গেই গুণগতমানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। বাজারে এ অবস্থায় উত্তোলিত মাছকে আঞ্চলিক ভাষায় বাসি মাছ বলে। সদ্য ধৃত মাছ এবং বাসি মাছের বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। তাই সম্ভব হলে সদ্য ধৃত বা টাটকা মাছ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করলে ভাল মূল্য পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ তুলে বাজারজাতকরণ করতে হবে। সম্ভব হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে (ঈদ/পূজা) সামনে রেখে অতি সকালে মাছ বাজারজাত করতে হবে।

১০. তথ্য সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও পরবর্তী পরিকল্পনা: মাছচাষে সফলতা অর্জন করতে হলে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল তথ্যাদি রেকর্ড বইয়ে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। রেকর্ড বইয়ে চাষির নাম ও ঠিকানা, পুকুরের অবস্থান, আয়তন ও বৈশিষ্ট্য, চুন, সার, বিষ প্রয়োগের মাত্রা, মজুদকৃত পোনার প্রজাতি, সংখ্যা এবং আকার, পোনা মজুদের তারিখ, চাষকালীন সময়ে সার এবং খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা, ক্রয়মূল্য, মাছের শারীরিক বৃদ্ধির হার, মাছ আহরণ, মাছচাষে মোট ব্যয়, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব তথ্য নিয়ে মৎস্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি আগামী মৌসুমে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাছের উৎপাদন, গুণগতমান এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে সে বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। এসব তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে না রাখলে কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষেই মৎস্যচাষিকে সঠিক পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়।

১১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: মাছচাষ যেহেতু কৃষিজাত পণ্যের একটি অংশ এবং ঋতু নির্ভরশীল। তাই এ ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ঝুঁকি থাকাই স্বাভাবিক। মৎস্যচাষির ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো হলো- বন্যা, অতিরিক্ত খরা, মাছের বাজারদর, শীতকালীন ঝুঁকি বা রোগব্যাধি, মাছ চুরি, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি। এসব সমস্যাদি নিম্নোক্তভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

- বন্যায় মাছ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বন্যা আসার আগেই বড় আকারের মাছগুলো আংশিক আহরণের মাধ্যমে তুলে ফেলতে হবে
- শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে মাছচাষ সম্ভব নয় এমনকি গভীর বা অগভীর নলকূপের সাহায্যেও পানি বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা করা না যায় সেখানে অবশ্যই বিক্রয়যোগ্য মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে
- ভাল বাজারমূল্য প্রাপ্তির নিরিখে সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকলে সবাই যে মৌসুমে মাছ বিক্রি করবে তখন মাছ বিক্রি না করে পরে যখন বাজারে কম পরিমাণ মাছের সরবরাহ থাকবে তখন মাছ বিক্রি করলে অনেক বেশি লাভ পাওয়া যেতে পারে

- শীতকালে যেহেতু মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাই বিক্রয়যোগ্য মাছ বিক্রি করে পুকুরে মাছের জীবভর কমিয়ে দিতে হবে এবং
- নমুনায়ন (Sampling) যদি দিনের বেলায় লোক সম্মুখে করা হয় তাহলে বড় মাছ দেখে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকেই মাছ চুরি করতে আগ্রহী হতে পারে। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে নমুনায়ন করা উচিত। এছাড়াও আহরণযোগ্য মাছ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রির ব্যবস্থা করা উচিত। মাছ চুরি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো বিশ্বস্ত পাহারাদার নিয়োগ করা।

অনুসন্ধানমূলক কাজঃ

তোমার গ্রামের একজন মাছচাষি ভোর বেলা তোমায় এসে জানালো যে তার পুকুরে সমস্ত মাছ হঠাৎ ভেসে মারা যাচ্ছে। তুমি পুকুর পরিদর্শন করলে। পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
ঠিকানা	
পুকুরের আয়তন	
পুকুরে ভেসে আছে কোন কোন প্রজাতির মাছ?	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.
কোন/কোন কোন প্রজাতির মাছের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ?	১. ২. ৩
আকাশের অবস্থা কেমন ছিল ?	
পুকুরের পানির রঙ কেমন ছিল ?	
পুকুরে নিয়মিত খাদ্য দেওয়া হয় কিনা ?	
এই অবস্থায় দ্রুত তুমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ?	
আর যেন এমন না ঘটে তার জন্য তুমি দীর্ঘ মেয়াদি কি ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ দিলে ?	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে পোনা মজুদপূর্ব, পোনা মজুদকালিন এবং পোনা মজুদ পরবর্তী কাজগুলো পর্যায়ক্রমে লেখ।

ক্রম.	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক/গৃহিত ব্যবস্থা সমূহ
০১	পোনা মজুদপূর্ব	
০২	পোনা মজুদকালীন	
০৩	পোনা মজুদপরবর্তী	

জব ১: পুকুরের অপ্রয়োজনীয় জলজ আগাছা পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও দমনে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে এক জায়গা জমা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	সেফটি সু	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৭	ডেটল	ডাক্তরী গ্রেড	১ বোতল
০৮	কটন	ডাক্তরী গ্রেড	পরিমান মত
০৯	ইনজুরি টেপ	ডাক্তরী গ্রেড	৪-৫ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস ও মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেকট্রনিক্স সুক্ষ ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	দা	মাঝারি আকারের	১ টি
০৩	দড়ি	সাধারন, ৫০ মিটার	১ টি
০৪	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০৫	কাঠের/লোহার হাতল	মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৬	স্টিলের বাটি	২ লিটার	১ টি
০৭	ঝুড়ি	প্রয়োজনমত	১ টি
০৮	স্পেসিমেন জার	১-৪ লিটার	৪ টি
০৯	প্ল্যাংকটন নেট	মাঝারি মাপের	১ টি
১০	খাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি

১১	পেন্সিল	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
১২	মোটা খড়ের দড়ি	পুকুরের মাপে	১ টি
১৩	সাবমার্জেবল ম্যাকানাইজড উডকাটার	সাধারণ মানের	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা/পরিমান
০১	কপার সালফেট	সাধারণ	৫০০ গ্রাম
০২	সিমাজিন	দেশি	৫০০ গ্রাম
০৩	এনডোথল	দেশি	৫০০ গ্রাম

(ঘ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পাড় হতে, পানির উপর ভাসমান, লতানো বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ কর এবং শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী শনাক্ত কর।

২. প্রতিটি শ্রেণির দুই একটি করে নমুনা ফরমালিন দ্রবণে লেবেল যুক্ত স্পেসিমেন জারে সংরক্ষণ কর।

৩. যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমস্ত আগাছা কেটে ফেল।

৪. কর্তনকৃত সমস্ত আগাছাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে জমা কর।

কাজের সাবধানতা:

- আগাছা দমনের সময় দা, কাঁচি, ছুরি অতি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- পানির ভিতরে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি সু ও লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন :

অপ্রয়োজনীয় জলজ আগাছা পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও দমনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: মৎস্যভূক ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন সংগ্রহ করা
- সঠিক ভাবে রোটেনন গুলানো এবং বল বানানো
- সঠিক পদ্ধতিতে রোটেনন প্রয়োগ করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	ছাতা	সাধারণ	১ টি
০৭	রেইন কোট	সাধারণ	১ টি
০৮	লাইফ জ্যাকেট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেকট্রনিক্স ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৩	ক্যালকুলেটর	সাধারন	১ টি
০৪	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	৩ টি
০৫	কাঠের/লোহার হাতল	মাপমত	১ টি
০৬	স্টিলের বাটি	২ লিটার	২ টি
০৭	খাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২ টি
০৮	পেন্সিল	প্রয়োজন অনুযায়ী	২ টি
০৯	ঝুড়ি	মাঝারি মাপের	২ টি
১০	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	২ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	রোটেনন পাউডার	৯ মাত্রার	১.০ কেজি

কাজের ধারা

১. রোটেনন প্রয়োগের জন্য একটি পুকুর নির্বাচন কর।

২. পুকুরে জলায়তন নির্ণয়ের জন্য মাপন ফিতা ব্যবহার করে পানি বরাবর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা মেপে নাও।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গুণ করে জলায়তন নির্ণয় কর। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ফুটে দেয়া থাকলে তাকে ৪৩৫.৬ দ্বারা ভাগ করে শতাংশ বের কর (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)।

৪. এবার ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসাবে মোট রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় কর। ব্যবহারিক খাতায় ছকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, জলায়তন ও রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	মোট জলায়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা (ফুট)	রোটেননের পরিমাণ (গ্রাম)
৫০	৩৫	৪.০২	৫	৫০৩ গ্রাম

৫. মোট রোটেননের ৩ ভাগের ২ ভাগ রোটেনন (৩০০ গ্রাম) হাড়িতে করে যথেষ্ট পরিমাণে পানিতে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দাও

৬. বাকি $\frac{১}{৩}$ ভাগ রোটেনন (২০২ গ্রাম) অল্প পানি দিয়ে গামলায় এমনভাবে গুলাও যেন শুকনা দলা বানানো যায়। এভাবে তৈরিকৃত দলাকে ছোট ছোট বল আকারে তৈরি করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৭. ৫-১০ মিনিট পর জাল টেনে আক্রান্ত মাছ ধরে ফেল।

৮. গৃহীত কাজের ধারাটি ব্যাবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ কর।

কাজের সাবধানতা

- রোটেনন ছিটানোর সময় অবশ্যই চোখে গগলস, হাতে গ্লাভস ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- রোটেনন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে। বাতাসের বিপরীতে ছিটাতে হলে এমনভাবে ছিটাতে হবে যেন তা চোখে মুখে এসে না লাগে।

আত্ম প্রতিফলন :

মৎস্যভুক ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: মাছ চাষের পুকুরে চুন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- পরিমাণ মত চুন সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	ছাতা	সাধারণ	১ টি
০৭	রেইন কোট	সাধারণ	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেকট্রনিক্স ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	দাড়িপাল্লা/নিক্তি	সাধারন	১ টি
০৩	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৪	ক্যালকুলেটর	সাধারন	১ টি
০৫	সিমেন্টের চাড়ি	২০ লিটার	১ টি
০৬	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০৭	কাঠের/লোহার হাতল	মাপমত	১ টি
০৮	স্টিলের বাটি	২ লিটার	১ টি
০৯	ঝুড়ি	মাঝারি	২ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	কলিচুন	সাধারণ মানের	১০ কেজি
০২	ডলোচুন	সাধারণ মানের	১০ কেজি
০৩	পাথুরে চুন	সাধারণ মানের	১০ কেজি
০৪	ব্লিচিং	সাধারণ মানের	২ কেজি

(ঘ) কাজের ধারা

১. চুন প্রয়োগের জন্য আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট পুকুরের পাড়ে মজুদ রাখ।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান কর।

৩. মাপন ফিতা দিয়ে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারে বা ফুটে মাপ এবং নিচের হিসাব অনুযায়ী পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর।

দৈর্ঘ্য (মিটার)× প্রস্থ (মিটার)÷৪০.৪৮ = শতাংশ

অথবা, দৈর্ঘ্য(ফুট)× প্রস্থ (ফুট)÷ ৪৩৫.৬ = শতাংশ

৪. আয়তন অনুযায়ী শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন কাটা ব্যারেলে/সিমেন্টের চাড়িতে রাখ। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চুনের মধ্যে পানি ঢাল। চুনে পানি দিলে সহসা গরম হয়ে চুন টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। এ সময় চুনের কাছ থেকে দূরে সরে যাও। কারণ যে কোন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৫. চুন ঠাণ্ডা হলে ব্যারেলে বেশি করে পানি মেশাও এবং মগের সাহায্যে সুন্দর করে মিশ্রিত কর। এবারে তরল চুন বালতিতে নিয়ে বাটির সাহায্যে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৬. পুকুর শুকনো হলে ব্যারেলের পরিবর্তে সমতল মাটিতে/সিমেন্টের চাড়িতে চুন রেখে হালকা করে পানি দিয়ে আগের দিন রাতে ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চুন ফেটে যাবে এবং সব চুন গুড়া পাউডারের মত হবে। চুন যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলে পরে ঝুড়িতে করে পাড়সহ সারা পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৭. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যাবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

কাজের সতর্কতা:

- চুন ভেজানোর জন্য প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার না করা
- চুন ছিটানোর সময় অবশ্যই চোখে গগল্‌স, হাতে গ্লাভস্‌ ও মাস্ক পরিধান করা
- চুন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে

আত্ম প্রতিফলন:

মাছ চাষের পুকুরে চুন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: পুকুরে সার প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত সার নির্বাচন
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- সঠিক ভাবে গুলানো
- সঠিক পদ্ধতিতে ছিটানো
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	শিক্ষার্থীদের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	শিক্ষার্থীদের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	সাধারণ	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেকট্রনিক্স সূক্ষ্ম ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৩	ক্যালকুলেটার	সাধারন	১ টি
০৪	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০ লিটার	১ টি
০৫	কাঠের/লোহার হাতল	মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৬	স্টিলের বাটি	২ লিটার	১ টি
০৭	খাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
০৮	পেন্সিল	প্রয়োজন অনুযায়ী	২ টি
০৯	ঝুড়ি	মাঝারি	১ টি
১০	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	১ টি
১১	মাপন ফিতা	সাধারণ	১ টি
১২	সেকি ডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইউরিয়া	বাংলাদেশী	৫ কেজি
০২	টিএসপি	বাংলাদেশী	৫ কেজি
০৩	কম্পোস্ট	বাংলাদেশী	২০ কেজি

কাজের ধারা:

- পুকুরের নিকট যাও। সেক্কিডিস্কের সাহয্যে পুকুরের স্বচ্ছতা পরিমাপ কর। সেক্কিডিস্ক স্বচ্ছতা ৩৫ সে.মি. এর বেশি হলেই সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ কর।
- মাপন ফিতার সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে জলায়তন নির্ণয় কর।
- আয়তন অনুযায়ী ইউরিয়া, টিএসপি ও কম্পোস্ট সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- টিএসপি এবং কম্পোস্ট সার একটি গামলা বা বালতিতে ৩-৪ গুণ পানির মধ্যে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখ। অতঃপর প্রয়োগর সময়ে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইউরিয়া সার মিশিয়ে নাও।
- ভেজানো সার কাঠের হাতল দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নাও।
- সূর্যালোকিত দিনে ১০-১১ টার মধ্যে মিশ্রিত সার সারা পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

কাজের সতর্কতা:

- সার ছিটানোর সময় অবশ্যই সেফটি সু, গগলস, গ্লাভস্ ও মাস্ক পরিধান করতে হবে
- বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা দিনে অবশ্যই সার ছিটানো থেকে বিরত থাক
- প্রখর সূর্যালোক যুক্ত সময়ে সার প্রয়োগ করি।

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরে সার প্রয়োগের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: সেক্কিডিস্কের সাহায্যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত সেক্কিডিস্ক নির্বাচন করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত সেক্কিডিস্ক যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিস্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	শিক্ষার্থীদের মাপ অনুযায়ী	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সেক্কিডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১ টি
০২	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

- মাছ চাষ হয় এমন একটি পুকুরের কাছে রৌদ্রময় দিনে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে যাও
- পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে ধীরে ধীরে কোমর সমান পানিতে নাম
- সেক্কিডিস্ক আস্তে আস্তে পানিতে ডুবাতে থাক এবং উপর থেকে দেখতে থাক কখন চাকতিটি পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়
- এবারে সেক্কিডিস্ক বাঁধা সুতা মিটার স্কেল দিয়ে মেপে সেক্কিডিস্কের গভীরতা নির্ণয় কর
- এভাবে পুকুরের আরও দুইটি স্থানে ঘোলাত্ব এড়িয়ে সেক্কিডিস্ক গভীরতা নির্ণয় কর

কাজের সতর্কতা:

- প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের সময় অবশ্যই সেফটি সু, গ্লাভস ও মাস্ক পরিধান করা আবশ্যক
- বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা দিনে অবশ্যই পরিমাপের কাজ থেকে বিরত থাক

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরে সেক্কিডিস্কের সাহায্যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৬: সুস্থ ও সবল পোনা নির্বাচনে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- উপযুক্ত আকারের পোনা নির্বাচন
- সঠিক ভাবে সুস্থ্য সবল পোনার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষাকরণ
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামছা	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	লাইফ জ্যাকেট	মাঝারী আকারের	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	আতশ কাচ	৫ সেমি	১ টি
০২	খাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
০৩	পেন্সিল	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
০৪	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৫	স্কেল	১ মিটার	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাছের পোনা	৮-১০ মে.মি.	৫০ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

- পূর্বে থেকে একজন পোনা ব্যবসায়ীকে ঠিক করে রাখ যাতে অনুশীলনের সময় পোনা নিয়ে আসে। একটা বড় গামলায় কতগুলো পোনা পাতিল থেকে নাও
- হাতের আঙ্গুল দিয়ে পোনার আকার ৮-১০ সে.মি. কিনা অনুমান কর। স্কেল ব্যবহার করে ২-১ টা পোনার সঠিক আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হও
- মাছের পোনা লাফালাফি করে কিনা এবং যথেষ্ঠ প্রাণশক্তি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর
- পোনার গায়ের রং স্বাভাবিক উজ্জ্বল কিনা, আঁইশ উঠা কিনা বা শরীরে কোন দাগ আছে কিনা তা আঁতশ কাঁচ দিয়ে পর্যবেক্ষণ কর
- পোনার পাখনা অক্ষত কিনা, কোনটা ভাঙ্গা, ছেড়া কিনা আঁতশ কাচ দিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য কর
- পোনার গা পিচ্ছিল কিনা অর্থাৎ গায়ে শ্লেশ্মা আছে কিনা অথবা খসখসে কিনা হাত দিয়ে পর্যবেক্ষণ কর
- প্রতিটি পোনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, হৃষ্টপুষ্ট আছে না রোগাক্রান্ত, দূর্বল বা চিকন তা লক্ষ্য কর
- গৃহীত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

কাজের সতর্কতা:

- পোনার গায়ে ক্ষত বা পোনা খসখসে কিনা খুব সাবধানতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরে মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা নির্বাচনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৭: পোনা শোধনের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য পুকুর পাড়ে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্‌স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	গামছা	মাঝারি মাপের	১ টি
০৪	ঘন ম্যাস সাইজের জাল	মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৫	ইলেকট্রনিক্স ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ কেজি	১ টি
০৬	চা চামচ	মাঝারি মাপের	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাছের পোনা	৪-৫ ইঞ্চি মাপের	৫০ টি
০২	পটাশ বা পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	ডাক্তারী গ্রেড	৫০ গ্রাম
০৩	খাবার লবন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড	সাধারন	৫০০ গ্রাম

(ঘ) কাজের ধারা

- একটি বালতির মধ্যে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পরিমাণ পটাশ (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশাও ।
- এবার অভ্যন্তকরণকৃত পোনা হতে হাত জাল দিয়ে পোনা উঠিয়ে বালতির মিশ্রণে ৩০ সেকেণ্ড ডুবিয়ে পুকুরে ছাড়। প্রজাতি অনুযায়ী পোনা গণনার কাজ এ সময় করে নাও ।
- ৩০০-৫০০টি পোনা শোধনের পর আরেক বালতি মিশ্রণ তৈরি কর এবং আরও পোনা শোধন করে পুকুরে মজুদ কর ।
- গৃহীত কার্যপ্রণালী ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

কাজের সাবধানতা:

- পোনা জলাশয়ে ছাড়ার ঠিক আগে শোধন করতে হবে।
- একই মিশ্রণ বারবার ব্যবহার করা কখনই যাবেনা।

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরে মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা শোধনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৮: পোনা অভ্যস্থকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য পুকুরের পানির কিনারায় উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা
- সঠিক পদ্ধতিতে অভ্যস্থ করা
- নিদৃষ্ট সময় নিয়ে অভ্যস্থ করা, কোন অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো না করা
- দুইটি পাত্রের পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	গামছা	মাঝারি মাপের	১ টি
০৪	থার্মোমিটার	সেন্টিগ্রেড	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

- পাতিল বা ব্যাগে করে আনা পোনা ছায়ায় বা ঠান্ডা স্থানে রাখ।
- থার্মোমিটার দিয়ে পাতিলের বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের তাপমাত্রা মেপে নাও।
- উভয় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি হলে ধীরে ধীরে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিলের পানিতে মিশাতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা কর।

- এবার পাতিল থেকে এক পঞ্চমাংশ পানি (২০%) ফেলে দিয়ে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিল পূর্ণ করতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা কর।
- এভাবে ২০% হারে পানি পরিবর্তনের ফলে পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হলে ব্যাগের মুখ পুকুরের পানিতে কাত করে ধরে হাত দিয়ে ব্যাগের মধ্যে পানির স্রোত দিতে হবে।
- স্রোতের বিপরীতে পোনাগুলো পাতিল থেকে বের হয়ে পুকুরে চলে যাবে।
- এবার হাড়ি বা পাতিল দিয়ে পানিতে ঢেউ দিতে হবে ফলে পোনাগুলো সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়বে।
- মেঘলা দিনে বা প্রখর রৌদ্রের সময় পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না।
- সকাল অথবা বিকাল বেলায় পোনা ছাড়া ভাল।
- পুরা কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

কাজের সতর্কতা:

- খুব ভোর বেলা অথবা সন্ধ্যা বেলা যখন পানির তাপমাত্রা কম থাকে তখন পোনা ছাড়তে হবে
- মেঘলা দিনে, বৃষ্টির মধ্যে বা প্রচন্ড রৌদ্রের ভিতর পোনা ছাড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরে মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা অভ্যস্থকরণের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৯: চাষকৃত মাছ আংশিক আহরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- আংশিক মাছ ধরার জন্য পুকুরের কোন পাড় থেকে জাল নামানো হবে এবং কোন পাড়ে উঠবে তা নির্ধারণ করা
- মাছ ধরার উপকরণ সংগ্রহ করা
- সঠিক পদ্ধতিতে জাল টানা
- ধরার জন্য উপযুক্ত মাছ নির্বাচন করা
- ছোট মাছগুলো সতর্কতার সাথে পানিতে ছেড়ে দেওয়া
- বিক্রয় উপযুক্ত মাছ গুলোকে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পরিচর্যা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লোভস	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগল্স	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৪	গামবুট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	ছাত্রের মাপ অনুযায়ী	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	৬ টি
২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
৩	গামছা	মাঝারি মাপের	জনপ্রতি ১ টি
৪	বেড় জাল	নাইলন সুতার, পুকুরের মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫	হাপা	নাইলনের দেশি	১টি
৬	ডিজিটাল ব্যালেন্স বা দাড়িপাল্লা	১.০-৫০.০ কেজি পর্যন্ত	১টি
৭	মাছ রাখার জন্য ঝুড়ি	প্লাষ্টিকের (২০ - ৫০ কেজি)	৪টি
৮	খাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১টি
৯	পেন্সিল	প্রয়োজন অনুযায়ী	১টি

(গ) কাজের ধারা

- বেড় জাল দিয়ে সারা পুকুরে মাছ টেনে এক জায়গায় নিয়ে আস।
- খুব সাবধানে বড় বড় মাছ বাছাই করে প্রজাতি অনুযায়ী গুণে গুণে মাছ ধরার পাত্রে রাখ।
- বাকি মাছ কোনভাবে যেন ধকল না পায় তাই আলতোভাবে ছেড়ে দাও।
- আহরণকৃত মাছের ওজন, দাম, জেলের পারিশ্রমিক ইত্যাদি রেকর্ড বইতে লেখে রাখ।
- সম্ভব হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রজাতি অনুযায়ী ধরে নেওয়া মাছের সম সংখ্যক বড় আকারের পোনা মজুদের ব্যবস্থা কর।
- পুনঃ মজুদের সময়ের মোট সংখ্যার ১০% এর বেশি পোনা মজুদ কর।
- গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রতিবেদন ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

কাজের সতর্কতা:

- সঠিক সময়ে মাছ ধরতে হবে। আর সেই কাজটা খুব সকালে ঠান্ডা আবহাওয়াতে করে ফেলা উত্তম, কারন মাছ ধরার সময় পুকুরের অনান্য মাছের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে, মাছ খাদ্য গ্রহন বন্ধ করে দেয় বিধায় অধিক তাপমাত্রায় আংশিক মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা উচিত
- বড় মাছগুলো ধরার সময় খুব সাবধানতার সাথে ছোট মাছ গুলো ছেড়ে দিতে হবে। বড় মাছের আঘাতে যেন ছোট মাছ ক্ষতি গ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- কোন প্রজাতির কতোটা মাছ ধরা হচ্ছে সেটা খুব সতর্কতার সাথে খাতায় লেখে রাখতে হবে। পরবর্তিতে পূনঃ মজুদের সময় তা দেখে পোনা ছাড়তে হবে

আত্ম প্রতিফলন :

মাছ চাষের পুকুরের আংশিক মাছ ধরার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-৩

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. পুকুরের পানিতে দৈনিক কত ঘন্টা সূর্যের আলো পড়া উচিত ?
২. কোন মাটির পুকুর মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম ?
৩. পুকুরের তলদেশে কতটুকু কাদা মাছচাষের জন্য উপযোগী ?
৪. নার্সারি পুকুরের আদর্শ গভীরতা কত ?
৫. জলজ আগাছা কাকে বলে ?
৬. পুকুরে অত্যধিক উদ্ভিদ প্লাংকটন নিয়ন্ত্রণে কী ঔষধ ব্যবহার করা হয় ?
৭. রোটেনন কোন উদ্ভিদ হতে তৈরি করা হয় ?
৮. রাক্ষুসে মাছ দমনে শতাংশ প্রতি রোটেননের মাত্রা কত ?
৯. পোনা শোধনের জন্য কি ঔষধ ব্যবহার করা হয় ?
১০. পুকুরে কখন পোনা ছাড়া ভাল ?
১১. নমুনায়ন/নমনুকরণ/Sampling বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ বলতে কী বুঝ ?
২. পুকুরে কীভাবে চুন প্রয়োগ করা হয় ?
৩. পুকুরে সার প্রয়োগের উপকারীতা লেখ ?
৪. ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে মাছ চাষ পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী ?
৫. ভাল ও খারাপ পোনা কিভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে ?
৬. সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতির সময় কী কী বিষয় প্রাধান্য দেয়া উচিত ?
৭. পুকুরে মজুদকৃত মাছের খাদ্যের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয় ?
৮. মাছচাষে ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো কী কী ?
৯. মাছচাষে প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষিকে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মৎস্য খামার বা পুকুর খননের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ আলোচনা করো।
২. অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভুক মাছ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৩. চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৪. পুকুর প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি আলোচনা করো।
৫. পোনা পরিবহণের আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৬. পোনা শোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
৭. পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষ

Mono Culture of Monosex Telapia



বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতি মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য খুবই উপযোগী। সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ততা, চাষে কম সময়, দ্রুত বেড়ে ওঠার ক্ষমতা এবং বাজার মূল্য বেশি থাকায় বর্তমানে অধিকাংশ মৎস্য চাষি মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। মনোসেক্স তেলাপিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের মৎস্য চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। স্থানীয় বাজারে চাহিদা ও এর উচ্চ বাজার মূল্যের জন্য খামারীরা বর্তমানে অধিক হারে এ মাছ চাষ করছে। প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণের দক্ষতা, সম্পূরক খাবারের প্রতি আগ্রহ, বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকা ও অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে চাষিদের কাছে এর জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশের জলবায়ুতে বছরে একই পুকুরে কমপক্ষে ২ বার এ মাছের চাষ করা যায়। তাই আমাদের দেশে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের বেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মনোসেক্স তেলাপিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি এবং পুকুর ব্যবস্থাপনা করতে পারব
- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের পুকুর প্রস্তুত করতে পারব
- মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ ও মজুদ পরবর্তী কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারব
- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারব

৪.১ মনোসেক্স তেলাপিয়া

তেলাপিয়া মাছ মাঝারি আকারের এবং বাংলাদেশের স্থানীয় মাছ নয়। তেলাপিয়া মাছের আদি নিবাস আফ্রিকা। নাইলোটিকা Cichlidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত Oreochromis-গণের একটি স্বাদু পানির মাছ। এই মাছ স্বল্প সময়ে অধিক বর্ধনশীল। ১৯৭৪ সালে UNICEF প্রথম থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এই মাছ আমদানি করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো থাইল্যান্ড থেকে এই মাছ আমদানি করে। তেলাপিয়া চাষের বড় সমস্যা হলো এর অনিয়ন্ত্রিত বংশ বিস্তার। এই ধরণের অনিয়ন্ত্রিত বংশবিস্তারের কারণে পুকুরে বিভিন্ন আকারের তেলাপিয়া মাছ দেখা যায়। এতে করে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ তেলাপিয়া মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি।

অনেকেরই ধারনা যে, মনোসেক্স তেলাপিয়া বোধহয় একটা বিশেষ জাতের তেলাপিয়া। আসলে এটা হচ্ছে "গিফট" (GIFT- Genetically Improved Farmed Tilapia) নামের তেলাপিয়া। মৎস্য বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণে দেখেছেন যে, একই খাবারে একই সময়ে স্ত্রী তেলাপিয়ার চাইতে পুরুষ তেলাপিয়া বেশী বাড়ে এই চিন্তাকে পুঁজি করেই হরমোন খাইয়ে তেলাপিয়াকে বাহ্যিকভাবে পুরুষে রূপান্তরিত করা হয়। যেহেতু তেলাপিয়াকে একই লিঙ্গবিশিষ্ট (পুরুষ) মাছে রূপান্তরিত করা হয় সেই জন্যই ইংরাজীতে "Mono Sex Telapia" বলা হয়।

মাছ চাষে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের গুরুত্ব

তেলাপিয়া মাছ দ্রুত বাড়ে এবং ৬ মাসের মাধ্যেই ৬০০-৭০০ গ্রামের মাছ বাজারজাত করা যায়। ফলে লাভসহ বিনিয়োগের অর্থ দ্রুত ফেরত পাওয়া যায় বলে চাষীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি মাছ। যে সকল কারণে এই মাছ চাষীদের গুরুত্বপূর্ণ তাহলো-

- উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এবং চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা সহজতর
- মনোসেক্স তেলাপিয়া শুধুমাত্র পুরুষ তেলাপিয়া হওয়ায় স্ত্রী তেলাপিয়ার অভাবে প্রজনন সম্পন্ন করতে পারে না ফলে পুকুরে বাচ্চা হয় না এবং চাষে কোন বিঘ্ন ঘটে না
- সম্পূরক খাবার দিয়ে অধিক ঘনত্বে মিঠা বা অল্প লবণাক্ত পানিতে চাষ করা যায়
- মনোসেক্স তেলাপিয়া এককভাবে চাষ ছাড়াও রুই, কাতলা, সিলভার কার্প ইত্যাদি মাছের সঙ্গে একই পুকুরে মিশ্রচাষ করা যায়
- সব রকমের পুকুরে এই মাছ চাষ করা যায় এবং
- এই মাছের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

২০২৫

৪.২ তেলাপিয়াকে মনোসেক্স মাছে রূপান্তরের কারণ

অদ্যাবধি তেলাপিয়া জাতের মোট ৩টি প্রজাতি বাংলাদেশে আমদানী করা হয়েছে। যেমন-তেলাপিয়া মোজাম্বিকা (*Oreochromis mossambicus*), নাইলোটিকা (*O.niloticus*) এবং লাল তেলাপিয়া (*Tilapia nile*)। অতি প্রজননক্ষম, স্বল্প উৎপাদনশীল, ছাই রঙের বিধায় তেলাপিয়া মোজাম্বিকা মৎস্য চাষির কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। অপর পক্ষে নাইলোটিকা এবং লাল তেলাপিয়া তুলনামূলক কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেলেও লাল তেলাপিয়ার প্রত্যেক প্রজন্মে কিছু মাত্রায় কাল দাগযুক্ত মাছ জন্মায় বলে ইহাও ততটা বাজার দখল করতে পারেনি। তাই ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ফিলিপাইন থেকে নাইলোটিকার GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) জাত আমদানী করে নির্বাচিত প্রজনন ও জেনিটিক গবেষণার মাধ্যমে অধিক উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যার নাম দিয়েছেন BFRI-GIFT জাত। এ জাত অন্যান্য তেলাপিয়ার চেয়ে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বেশি উৎপাদনশীল বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ BFRI-GIFT জাতকে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত করলে স্বাভাবিক তেলাপিয়ার চেয়ে উৎপাদন অনেকগুণে বেড়ে যায়।

৪.৩ লিঙ্গ পৃথকীকরণ

লিঙ্গ পৃথকীকরণ বা তেলাপিয়া মাছকে কিভাবে মনোসেক্স তেলাপিয়ায় আলাদা করা বা রূপান্তরিত করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

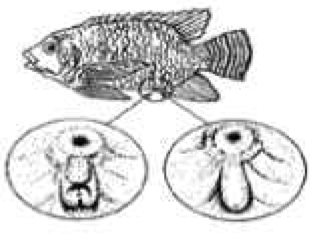
ক) বাছাই এর মাধ্যমে লিঙ্গ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া:

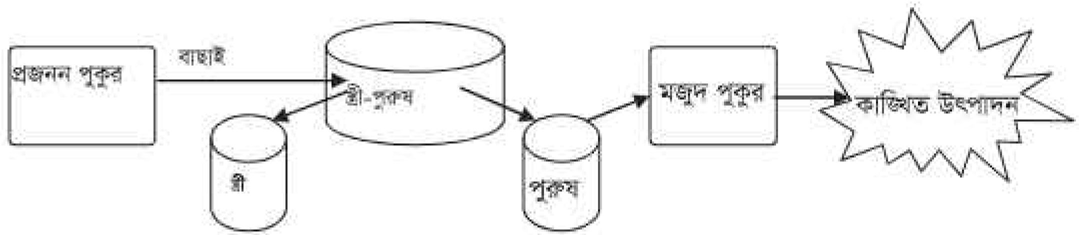
এ প্রক্রিয়ায় বাহ্যিকভাবে জনন অঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে পৃথক পৃথক ভাবে শনাক্ত ও পৃথক করে পুরুষ কিংবা স্ত্রী মাছকে আলাদা ভাবে চাষ করা হয়। এভাবে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে আলাদাভাবে পৃথক পৃথক পুকুরে চাষ করলে যৌনমিলনের সুযোগ না থাকায় পোনা উৎপাদিত হয় না। ফলে পুকুরে মজুদকৃত মাছের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে এবং উৎপাদন আশানুরূপ হয়। বাছাই পদ্ধতিতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে চোখে দেখে পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাতি আলাদা করা হয় তাই এ কাজে নিয়োজিত কর্মী দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হলে এ পদ্ধতি তত বেশি ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। নিম্নে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো-

বাছাই করার সময়ে মাছের ওজন ও পদ্ধতি:

সাধারণত প্রতিটি মাছের ওজন যখন ৩৫-৪০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য ৭-৯ সেন্টিমিটার হবে তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তেলাপিয়ার পুরুষ এবং স্ত্রী মাছকে পার্থক্য করা যায়। কারণ এ সময় তেলাপিয়ার জনন অঙ্গের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সময় মাছের লিঙ্গ অনুযায়ী বাছাই ও পৃথককরণের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে বাছাই এর ক্ষেত্রে এ পৃথকীকরণ যত কম বয়সে করা যাবে এ পদ্ধতিতে চাষের সফলতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

স্ত্রী এবং পুরুষ তেলাপিয়ার শরীরবৃত্তীয় পার্থক্য

পুরুষ তেলাপিয়া		স্ত্রী তেলাপিয়া
পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় ২ ছিদ্র বিশিষ্ট, সাদা ও লম্বাটে ।		স্ত্রী মাছের জননেন্দ্রিয় ৩ ছিদ্র বিশিষ্ট খাটো ও লালচে রঙের ।
প্রজননকালে এ ক্ষেত্রে গলার অংশের বর্ণ লালচে দেখায় ।		এ ক্ষেত্রে ততটা লালচে বর্ণ দেখা যায়না, কিছুটা হলদেটে ভাব দেখায়।



চিত্র-৪.১ বাহ্যিকভাবে বাছাই এর মাধ্যমে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া

সীমাবদ্ধতা

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশব অবস্থায় স্ত্রী এবং পুরুষ মাছ পৃথক ভাবে সনাক্ত করা যায় না,
- চাহিদা অনুসারে এক লিঙ্গ বিশিষ্ট মাছের পোনা সংগ্রহ করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও ততটা লাভজনক নয়।

খ) হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি :

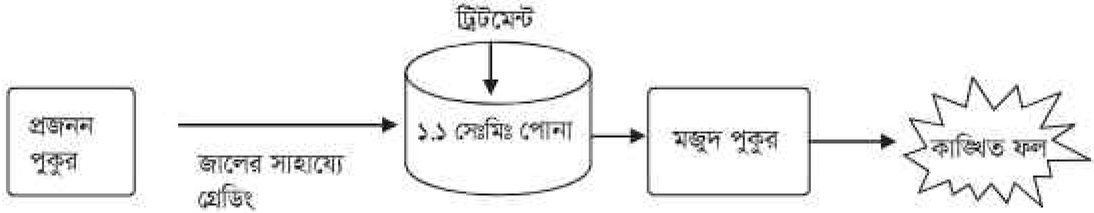
হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বের উন্নততর প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট আকারের তেলাপিয়া/নাইলোটিকার পোনাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাদ্যের সাথে সেক্স হরমোন খাওয়ানো হয়। এতে ৯০-৯৫ শতাংশ এক লিঙ্গের মাছ পাওয়া যায়। এ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলি হলো-

হরমোন নির্বাচন : এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে হরমোন নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে একাধিক সেক্স হরমোন কিনতে পাওয়া যায়। যেমন- স্ত্রী মাছকে পুরুষ মাছে রূপান্তরিত করার জন্য পুরুষ সেক্স হরমোন টেসটোস্টেরণ (Testosterone) এবং পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত করার জন্য স্ত্রী সেক্স হরমোন ইস্ট্রোজেন (Estrogen)। চাষকৃত মাছকে কোন লিঙ্গে রূপান্তরিত করা হবে তা ঠিক করে নিয়ে তার জন্য কোন হরমোন প্রয়োগ করতে হবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে সেক্স হরমোন নির্বাচন : প্রায় সব প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রেই একই ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করার পরেও শুধুমাত্র লিঙ্গভেদের কারণে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছ সমহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেমন-

রাজপুঁটির ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ মাছের চেয়ে স্ত্রী মাছ দ্রুত বাড়ে। এটা পরীক্ষিত যে একই সময়ে একই ব্যবস্থাপনায় পুরুষ মাছ ১০০ গ্রাম হলে স্ত্রী মাছ ১২৫ গ্রাম হয়ে থাকে। অপরপক্ষে তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ স্ত্রী তেলাপিয়ার চেয়ে পুরুষ তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। তাই এ ক্ষেত্রে পুরুষ তেলাপিয়ার উৎপাদন বেশি বলে পুরুষ সেক্স হরমোন নির্বাচন করাই শ্রেয়।

সেক্স হরমোন প্রয়োগ : মাছের রেণু ফোটার পরবর্তী ১-২ সপ্তাহের মধ্যেই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির মাধ্যমে তেলাপিয়ার পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ চিহ্নিত হয়। এই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির আগে থেকে ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ হরমোন প্রয়োগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়ে থাকে। তাই ডিম থেকে তেলাপিয়া/নাইলোটিকার পোনা ফুটে বের হবার ২-৩ দিন পর যখন স্বাভাবিকভাবে এরা খাবার খেতে শিখে কিংবা ০.৮-১.১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হবে তখন পোনাকে প্রজনন পুকুর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।



চিত্র-৪.২ হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে মনোসেক্সে রূপান্তর প্রক্রিয়া

পোনা সংগ্রহের এবং দৈর্ঘ্য নিশ্চিত হওয়ার একটি সহজ পদ্ধতি হলো ক্ষুদ্র ফাঁস সম্পন্ন জালের সাহায্যে পোনাগুলোকে সংগ্রহ করে এদেরকে ০.৩ সেন্টিমিটার ফাঁস সম্পন্ন স্কুপ নেটের সাহায্যে গ্রেডিং করতে হবে। যে সমস্ত পোনা ঐ ফাঁস সাইজের জাল দ্বারা পার হয়ে যাবে শুধুমাত্র সেই পোনাগুলোকে হরমোন ট্রিটমেন্টের জন্য নির্বাচন করতে হবে। কারণ ০.৩ সেন্টিমিটার ফাঁস অতিক্রমকারী পোনার আকার ১.১ সেন্টিমিটার কিংবা তার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে। পোনার আকার সর্বোচ্চ ১.৩ সেন্টিমিটারের বেশি হলে সে ক্ষেত্রে হরমোন ট্রিটমেন্টের ফলাফল আশানুরূপ নাও হতে পারে।

হরমোন প্রয়োগ মাত্রা : সংগৃহীত এবং নির্বাচিত তেলাপিয়া/নাইলোটিকার পোনাকে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৬ মিলিগ্রাম হারে ১৭-আলফা মিথাইল টেসটোস্টেরণ হরমোন মিশ্রিত করে এক নাগাড়ে ২১ দিন খাওয়ালে তেলাপিয়ার সব পোনা পুরুষ তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত হবে।

খাদ্যের সঙ্গে হরমোন প্রয়োগের উপকারিতা : হরমোন মূলত মাছের খাদ্য ব্যবহারের কার্যকারীতাকে বৃদ্ধি করে। ফলে পরোক্ষ ভাবে মাছের উৎপাদনের খরচ কমিয়ে ফেলে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কার্পজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে খাদ্যের সাথে ১-৩ পিপিএম মাত্রায় ১৭-আলফা মিথাইল টেসটোস্টেরণ হরমোন প্রয়োগ করে ৮৭ শতাংশ বা তার বেশি পরিমান পোনা মনোসেক্সে রূপান্তরিত করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে উৎপাদিত পোনা পুকুরে চাষের জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে।

২০২৫

নার্সারি পুকুর নির্বাচন: যে পুকুরে ২১ থেকে-২৮ দিন বয়সের মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনা লালন পালন করা হয় তাকে নার্সারি পুকুর বলে। মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে পোনাকে নার্সারি পুকুরে ২০-২১ দিন পালন করা হয়। নার্সারি পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া হয় তা হলো-

- নার্সারির জন্য ছোট আকারের পুকুরই আদর্শ পুকুর। সাধারনত ২০-২৫ শতাংশের পুকুর হলেই ভাল হয়
- নার্সারি পুকুরটি আয়তাকার, বন্যামুক্ত এবং বেলে দোয়াশ মাটির হলে ভাল হয়
- নার্সারি পুকুরের পানির আদর্শ গভীরতা ৩-৪ ফুটের ভিতর থাকলেই ভাল এর থেকে কম পানি না থাকাই ভাল
- নার্সারি পুকুরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন অনেক বেশি হয়

৪.৪ নার্সারি ও পুকুর ব্যবস্থাপনা এবং চাষ পদ্ধতি

ক) নার্সারি ও পুকুর ব্যবস্থাপনা

মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজগুলো করতে হয় তাহলো-

১) পাড় মেরামত, আগাছা দমন এবং পাড় ফিল্টার নেট দিয়ে ঘেরা: নার্সারি পুকুরের পাড় তলার কাদা তুলে এমন ভাবে মেরামত করতে হবে যেন পাড় কোথাও ভাংগা না থাকে। পাড় মেরামতের পর পাড়ের এবং পুকুরের সমস্ত আগাছা তুলে পুকুর সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার করতে হবে। পাড়ে বড় কোন গাছপালা থাকলে তার ডাল কেটে দিতে হবে যেন পুকুরের পানিতে ছায়া না পড়ে এবং পাতা পড়ে পুকুরের পানি নষ্ট না হয়। এরপর পুকুরের পাড় ফিল্টার নেট দিয়ে এমন ভাবে ঘিরে দিতে হবে যেন বাইরের সাপ,ব্যাঙ বা অন্য কোন মৎস্যভূক প্রাণি এসে পোনা খেতে না পারে।

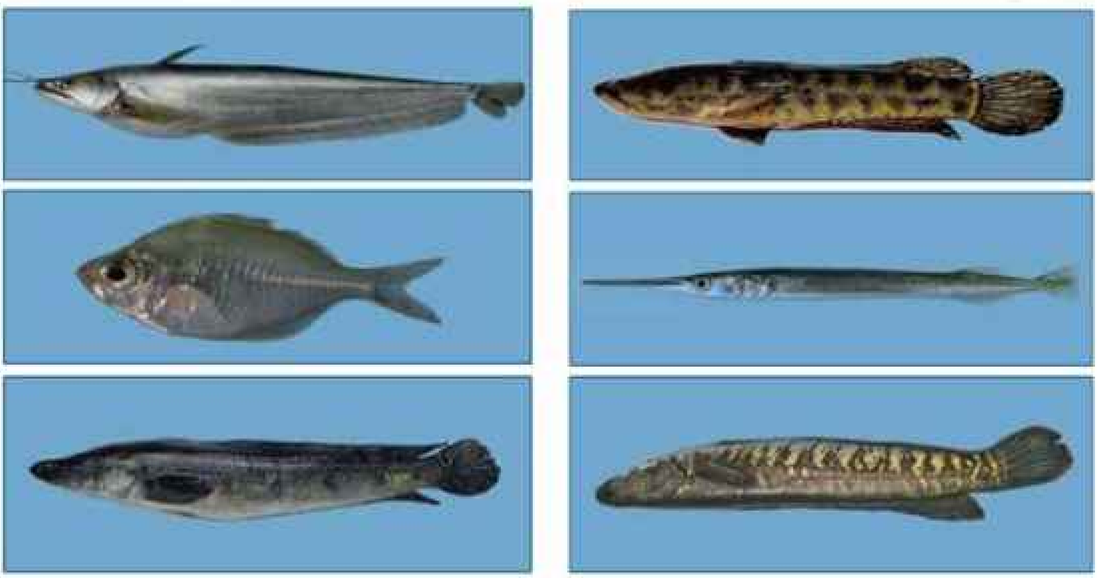


চিত্র-৪.৩ পুকুর ঘেরা দেয়া

২) অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছ দমন : সম্পূর্ণ পুকুর এমন ভাবে শুকাতে হবে যেন পুকুরের তলার মাটি ফেটে যায় এবং পুকুরের পানিতে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ না থাকে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে পুকুরের পানিতে প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩৫-৪০ গ্রাম করে রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ দমন করতে হবে। মোট রোটেননের দুই-তৃতীয়াংশ গুলিয়ে সমস্ত পুকুর ছিটিয়ে দিতে হবে এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ অল্প পানি দিয়ে পেষ্ট বানিয়ে ছোট ছোট গোল গোল বল বানিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুরে যেসব মৎস্যভূক ও অবাঞ্ছিত মাছ থাকে :

রাক্ষুসে মাছ	অবাঞ্ছিত মাছ (আমাছা)
গজার, শোল, টাকী, কৈ, মেনি, বেলে, শিং, মাগুর, ভেটকি, বোয়ল, বাইম, কুচিয়া, চিতল, পাবদা, বাচা, আইঁড় ইত্যাদি।	পুটি, চান্দা, লালচান্দা, তিতপুটি, মলা, দারকিনা, চাপিলা, কানপোনা, খলিসা, পটকা, চিংড়ী (ইচা), বৈচা, ইত্যাদি।



চিত্র- ৪.৪ বিভিন্ন প্রজাতির রাক্ষুসে মাছ

৩) চুন প্রয়োগ : পুকুরে রোটেনন পাউডার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পরে পানি যুক্ত পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি করে চুন পানিতে ভিজিয়ে ঠান্ডা করে সমস্ত পুকুর ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পানি শুকিয়ে ফেলা পুকুরে শুকনা চুন সমস্ত পুকুর ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪) পুকুরে পানি প্রবেশ : চুন দেওয়ার ২-৩ দিন পর পুকুরে ৩ থেকে ৪ ফুট পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে পুকুরে নলকূপের বা গভীর নলকূপের পানি প্রবেশ করানোটাই উত্তম। যদি কখনও অন্য কোনো উৎস্য থেকে পানি দেওয়া ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে তাহলে অবশ্যই পানির উৎস্য মুখ ও নির্গমন মুখে ঘন জালের ছাকনি ব্যবহার করতে হবে, যাতে কোন অবস্থাতেই বাহির থেকে কোন মাছ বা জলজ প্রাণি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।



চিত্র- ৪.৫ পুকুর হতে পানি সেচ ও প্রবেশ

৫) সার প্রয়োগ : নার্সারি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করার জন্য পুকুরে পানি দেওয়ার পরপরই অর্থাৎ চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর প্রতি শতাংশে ৫ কেজি জৈব সার, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫ গ্রাম এমওপি গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে টিএসপি এবং এমওপি সার অবশ্যই কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে যাতে সমস্ত টিএসপি পানিতে সহজেই গুলে যেতে পারে।



চিত্র- ৪.৬ তেলাপিয়ার পুকুরে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

৬) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : পুকুরে সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পরে পুকুরের পানির রঙ যখন হালকা সবুজ বা বাদামী বর্ণ ধারণ করবে তখন বুঝতে হবে পুকুরে যথেষ্ট পরিমান প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান।

৭) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা : পুকুরে মৎস্যভূক ও অবাঞ্ছিত মাছ দমনে বিষ প্রয়োগ করা হলে পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে অবশ্যই বিষক্রিয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করে পরে পোনা মজুদ করতে হবে। বিষক্রিয়া পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পুকুরের মধ্যে সবুজ ফিল্টার নেট বা গ্লাস নাইলনের হাপা স্থাপন করে তার মধ্যে ১০ - ১২ টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ছেড়ে দিতে হবে। যদি পোনা গুলো ২৪ ঘন্টায় মারা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পুকুরের পানির আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করা যেতে পারে।



চিত্র- ৪.৭ পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

আর যদি পোনা মারা যায় তবে আরও ৩-৪ দিন অপেক্ষা করে আবার বিষাক্ততা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে।

৮) পোকা মাকড় দমন : সার প্রয়োগের পর নার্সারি পুকুরে অনেক ধরনের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় সৃষ্টি হয় যা মাছের ছোট পোনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইসব পোকা মাকড় দমন করার জন্য নার্সারি পুকুরে প্রতি ঘনমিটার পানির জন্য ০.৫ মিলি লিটার করে সুমিথিয়ন অথবা ১ গ্রাম করে ডিপ্টারেক্স পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুর ছিটিয়ে দিতে হবে।



চিত্র- ৪.৮ পানির পোকা-মাকড় ও বিষ

৯) হররা বা জাল টানা : নার্সারি পুকুরে বিষ প্রয়োগ, সার প্রয়োগ এবং পোকা মাকড় দমনের পরে পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ পচনের ফলে বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস দূর করার জন্য পুকুরে পোকা-মাকড় দমন করার পর হড়রা বা জাল টানা জরুরি, হড়রা বা জাল টেনে দিলে পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস সমূহ বুদবুদ আকারে বের হয়ে যায়। পোকা মাকড় দমনের পরের দিনই এই কাজটি করে ফেলা দরকার।

২০২৫



চিত্র- ৪.৯ হররা টানা

১০) পোনার প্রজাতি নির্ধারণ ও পোনা মজুদ: মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনার প্রজাতি নির্ধারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন হলেও সঠিক প্রজাতি নির্ধারনের উপরই আমাদের মাছ চাষের সফলতা নির্ভরশীল বিধায় সঠিক প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী পোনা চিহ্নিত করে যথা সম্ভব পুরুষ তেলাপিয়া গুলো পুকুরে ছাড়া। প্রতি শতকের জন্য ২১-২৮ দিন বয়সের ২৫০০ থেকে ৩০০০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে;

১১) পোনার আকার পর্যবেক্ষণ: সমস্ত পোনা যেন একই আকারের হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাধারনত ২১-২৮ দিন বয়সের পোনা ০.৫ থেকে ১.০ ইঞ্চি আকারের হয়ে থাকে, এই ক্ষেত্রে যথা সম্ভব একই আকার পোনা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে প্রয়োজনে ঘন সূতার জাল ব্যবহার করে গ্রেডিং করে নেওয়া যেতে পারে।



চিত্র- ৪.১০ পোনার আকার পর্যবেক্ষণ

১২) পোনা পরিবহন: তেলাপিয়া হ্যাচারি থেকে সাধারনত অক্সিজেন সমৃদ্ধ পলিথিণ ব্যাগে করে পোনা প্যাকিং করে দেওয়া হয় এবং সেই পোনা বিভিন্ন পরিবহনে করে নার্সারিতে আনা হয়।

১৩) পোনা অভ্যস্থকরণ: পোনার গাড়ি আসার পর দ্রুতগাড়ী থেকে প্যাকেট গণনা পূর্বক পোনার প্যাকেট নার্সারি পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখা হয়, এভাবে ৫০ থেকে ৬০ মিনিট পুকুরের পানিতে পোনার প্যাকেট

২০২৫

পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে যাতে প্যাকেটের ভিতরের পানি এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা আস্তে আস্তে সমান হয়।

১৪) পোনা অবমুক্তকরণ: তাপমাত্রার সমতা আসল কিনা দেখার জন্য ব্যাগের মুখ খুলে দিয়ে নিজের হাত বা থার্মোমিটার দিয়ে ব্যাগ এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান দেখতে হবে, তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের কিছু পানি পুকুরে এবং পুকুরের কিছু পানি পাত্রে নিতে হবে, উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে ব্যাগটি পুকুরের দিকে কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ্য ও সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে।

১৫. পোনা শোধণ: তেলাপিয়ার নার্সারি পুকুরে পোনা ছাড়ার পরপরই প্রতি শতাংশে ১ কেজি করে লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে অন্যান্য জীবাণুনাশক ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৬. সঠিক মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ : সঠিক মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করে খাদ্যের অপচয় ও পুকুরের পানি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তেলাপিয়া পোনার খাদ্য হিসাবে ৩০-৩৫ % প্রোটিন সমৃদ্ধ তেলাপিয়ার ভাসমান নার্সারি খাবার নিম্নের ছক অনুযায়ী পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

পালন কাল	পোনার ওজন	খাদ্যের ধরণ	দৈনিক প্রয়োগ মাত্রা (দেহ ওজনের শতকরা হার)	দৈনিক কত বার প্রয়োগ করা হয়
১-৭ দিন	০.১৩-১ গ্রাম	নার্সারি	৩৫-৩০%	৪ বার
৮-১৪ দিন	২-৪ গ্রাম	নার্সারি	৩০-২০ %	৩-৪ বার
১৫-২১ দিন	৫-৬ গ্রাম	নার্সারি	২০-১৫ %	৩-৪ বার

নার্সারি পুকুরে ২০-২১ দিন পালনের পর প্রতিটি পোনার ওজন যখন গড়ে ৫-৬ গ্রাম তখন নার্সারি থেকে পোনা মজুদ পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

খ) মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি

১) পুকুর নির্বাচন: মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌসুমী পুকুর তথা যেসব পুকুরে স্বল্প গভীরতার কারণে কার্পজাতীয় মাছ চাষ সম্ভব নয় ঐ ধরণের পুকুরই এ মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আর স্বভাবজাত কারণে তেলাপিয়া যেহেতু পাড়ের ধারে বকচরে গর্ত করে তাই বাৎসরিক পুকুরের পরিবর্তে ২০-৩০ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট যে সমস্ত মৌসুমী পুকুরে ৪-৬ মাস ৩/৪ ফুট পানি থাকে সে ধরণের পুকুর তেলাপিয়া মাছচাষের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে সব ধরনের পুকুরই এই মাছ চাষের জন্য উপযোগী।

২) পুকুর প্রস্তুতি: পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি। পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিচের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে-

ক. পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা সম্পর্কে ধারণা : যে কোন আকার ও আয়তনের পুকুর মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য উপযোগী। তবে পুকুর আয়তাকার এবং তা উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বী হলে বছরের যে কোন ঋতুতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস নিশ্চিত হয় এবং জাল টানতে সুবিধা হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অগভীর বা গভীর সব ধরনের পুকুরেই মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য বেশ উপযোগী। এই মাছ যেহেতু ৪-৫ মাসের মধ্যেই বিক্রয় উপযোগী হয়ে যায় তাই পানির গভীরতা চাষের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনা পক্ষান্তরে মাছ আহরণের সময় পুকুর শুকিয়ে সমস্ত পুকুরে মাছ ধরা লাগে বলে অপেক্ষাকৃত কম পানির পুকুরই বেশি উপযোগি বলে বিবেচিত।

খ. পাড় সংস্কার : পুকুরের চারিদিকের সুউচ্চ বাধ যার কারণে পুকুরের বাইরের পানি ভিতরে ও ভিতরের পানি বাইরে যেতে পারেনা সেটাই পুকুরের পাড়। পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে প্রথমেই তা মেরামত করতে হবে। যাতে কোন ক্রমেই বাইরের নর্দমা বা অন্য কোন উৎস হতে দূষিত পানি বা অন্য কোন মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে এবং সেই সাথে পুকুরের চাষকৃত মাছ যেন বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।

গ. তলার পচা কাদা : পুকুরের তলদেশে ১৫ সেমি এর কম পরিমাণ কাদা থাকা উচিৎ। কাদা বেশি হলে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে ফলে পানিতে অধিক পরিমাণ মিথেন, কর্বন-ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয় যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত পচা কাদা থাকলে (১৫ সেমি বেশি) সম্ভব হলে পুকুর শুকিয়ে তা তুলে ফেলতে হবে। তা না হলে ঐ ধরণের পুকুরে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় (২ কেজি/শতাংশ) চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. পাড়ে গাছপালার অবস্থান : পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য দৈনিক ৬-৮ ঘন্টা সূর্যালোক পড়া প্রয়োজন। পুকুরের পাড়ের গাছপালা ঝোপঝাড় থাকার কারণে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাবে পর্যাপ্ত সার দেয়ার পরেও কাঙ্খিত পরিমাণ ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপন্ন হয় না। ফলে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন এর ঘাটতি দেখা দেয়। এজন্য পুকুরের পাড় ঝোপঝাড় মুক্ত রাখতে হবে। তাছাড়া পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় বা বড় গাছ পালা হতে পাতা পড়ে পুকুরের পানি বিষাক্ত / দুষিত করে ফেলে।



চিত্র- ৪.১১ গাছপালাযুক্ত পুকুর পাড়

পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রাপ্তি এবং পানিতে যেন বাতাসে ঢেউ খেলে সেজন্য পুকুর পাড়ে ছায়া প্রদানকারী কোন গাছপালা না থাকাই ভাল। থাকলে অবশ্যই সেগুলোর ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

ঙ. জলজ আগাছা অপসারণ: জলজ আগাছা হলো পুকুরে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ যা মাছ চাষে কোন উপকারে না এসে বরং ক্ষতি করে থেকে যেমন- কচুরিপানা, টোপাপানা, শাপলা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা, ক্ষুদেপানা ইত্যাদি পুকুরের পানিতে সূর্যালোক পড়তে ও বাতাস চলাচল করতে বাঁধা দেয় ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী ব্যহত হয়। তাছাড়া, এসব জলজ আগাছায় সাপ, ব্যাঙ আশয় নেয়। রোগ জীবানুর আশ্রয় স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে কোন ধরণের জলজ আগাছা থাকলে আগাছা নিয়ন্ত্রণের যেসব পদ্ধতি রয়েছে (কায়িক শ্রম, জৈবিক এবং রাসায়নিক) সেগুলোর মধ্যে আগাছার শ্রেণীভেদে যে পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ সেই পদ্ধতি বেছে নিয়ে পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই তা দূর করতে হবে।

চ. পাড় ফিল্টার নেট দিয়ে ঘেরা: মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি পুকুরের অনুরূপ আগাছা দমনের পরপরই পুকুরে বিষ দেওয়ার আগেই ফিলটার নেট দিয়ে পুকুরের পাড় এমনভাবে ঘিরে দিতে হবে যেন বাহির থেকে কোন মৎস্যভূক প্রাণি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।

ছ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ: এক্ষেত্রে পুকুরে কোন ক্রমেই রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ রাখা যাবে না। পুকুরে যদি রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ রয়েছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের জন্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে (পুকুর শুকিয়ে বা বিষ প্রয়োগ) এর মধ্যে সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। তবে পুকুর শুকানোর ক্ষেত্রে যেসব প্রতিকূলতা রয়েছে সেসব প্রতিকূলতা না থাকলে সে ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো সবচেয়ে উত্তম। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে প্রতিফুট পানির জন্য ২৫-৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জ. চুন প্রয়োগ: পুকুর প্রস্তুতির সময় সাধারণত ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবে মজুদকৃত মাছের রেচনদ্রব্য, প্রয়োগকৃত খাদ্যের অব্যবহৃত অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি পঁচে গিয়ে পানি অম্লীয় হতে পারে ফলে পুকুরের পানির পিএইচ কমে মাছের বৃদ্ধি থেমে বা কমে যেতে পারে বলে পুকুর প্রস্তুতির পরেও প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন/চুন সদৃশ উপকরণ প্রয়োগ করে পানির পিএইচ মাছচাষের অনুকূলে রাখলে মনোসেক্স তেলাপিয়ার বৃদ্ধি ভাল হয় এবং উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়।

ঝ. পুকুরে পানি প্রবেশ : চুন দেওয়ার ২-৩ দিন পর পুকুরে ৩ থেকে ৪ ফুট পানি দিয়ে পুকুর ভর্তি করে দিতে হবে। পুকুরে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ বা নলকূপের পানি প্রবেশ করানোই উত্তম কিন্তু গভীর নলকূপ বা নলকূপের পানি পাওয়া না গেলে যদি অন্য কোন উৎস থেকে পুকুরে পানি দিতে হয় তবে পানির উৎস মুখে এমনভাবে কাপড় বা নেট বা ছাকনি দিতে হবে যেন বাহির থেকে কোন অবাঞ্চিত প্রাণি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।

ঞ. সার প্রয়োগ : এ পদ্ধতিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যের ততবেশি প্রয়োজন নেই বিধায় সার প্রয়োগ ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি খুব বেশি প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হলে শ্বসনের ফলে রাতে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যেতে পারে। তাই মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে খুব বেশি সার প্রয়োগ না করাই ভাল। নিয়মিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করলে প্রয়োগকৃত খাদ্যের কিছু না কিছু অংশ পানিতে গলে যাবে যা সার হিসেবে কাজ করবে, এ ছাড়াও মাছের রেচন দ্রব্যও অনেক সারের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই জন্য এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পোনা মজুদের পূর্বে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : মনোসেক্স তেলাপিয়ার পুকুরে সার প্রয়োগের ২-৩ দিন পরে পুকুরে মাছের জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে পোনা মজুদ করতে হয়। যদি পর্যাপ্ত (পরিমিত) খাবার থাকে তাহলে পোনা ছাড়ার জন্য পরের কাজ গুলো চালিয়ে যেতে হবে আর যদি অতিরিক্ত খাবার হয়ে যায়, তাহলে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে পরের কাজ গুলো করতে হয়। পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের পরিমাণ কম হলে পুনরায় কিছু সার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার পুকুরে তৈরি করতে হয়।

ঠ. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা: মনোসেক্স তেলাপিয়ার পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে সন্তোষ জনক ফল পেলে তার পরের দিনই পুকুরের পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা হয়। বিষাক্ততা পরীক্ষা করে যদি পুকুর বিষমুক্ত প্রমানিত হয় তাহলে পুকুর পোনা মজুদের জন্য মোটামোটি প্রস্তুত বলে ধরে নেওয়া যায়।

ড. পোকা মাকড় দমন : পুকুর বিষমুক্ত হওয়ার পরের দিনই পুকুরের পোকা-মাকড় দমন করতে হবে কারণ প্রাকৃতিক খাদ্যের সাথে সাথে প্রচুর পরিমানে পোকাও পুকুরে জন্মে থাকে যা সদ্য মজুদ কৃত ছোট্ট পোনার জন্য বিপদজনক, তাই এদের দমন করা জরুরি।

ঢ. হররা বা জাল টানা : পোকা-মাকড় দমনের সাথে সাথে পুকুরে হররা বা জাল টেনে তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস সমূহ দূর করে ফেলতে হয় যাতে পোনার কোন ক্ষতি না হয় এবং পোনা মারা না যায়।



চিত্র- ৪.১২ হররা

৩) পোনা মজুদ: ব্যবস্থাপনার ধরন অনুযায়ী অর্থাৎ কি ধরণের সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হবে, দিনে কতবার খাদ্য প্রয়োগ করা হবে, কতটুকু খাদ্য প্রয়োগ করা হবে বিবেচনা করে সামর্থ্যানুযায়ী পোনা মজুদ করতে হবে। এ ছাড়াও পুকুরের উর্বরতা শক্তি কেমন, প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে পুকুরে নতুন পানি সংযোগ করার ব্যবস্থা আছে কি না ইত্যাদিও বিবেচনায় নিতে হবে। তবে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় শতাংশ প্রতি একক চাষে ২০০-২৫০টি ৫-৬ গ্রাম ওজনের (২১ -২৮ দিন বয়সের পোনা) মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করে ভাল ফলাফল আশা করা যায়।

ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্তকরণ: পোনার বর্ণ, চঞ্চলতা, ক্ষত, গায়ে পিচ্ছিল পদার্থ ইত্যাদি দেখে আমরা কার্পের পোনার মত ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্ত করতে পারি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটি গামলা বা থালায় পানি নিয়ে তার মধ্যে কিছু পোনা ছেড়ে থালার পানিতে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করি এবং যদি দেখি মাছের পোনা গুলো স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটছে বা কাটার চেষ্টা করছে তাহলে আমরা বুঝতে

পারব পোনা গুলো সতেজ পোনা বা সুস্থ্য পোনা আর যদি তা না করে যদি স্রোতের সাথেই পোনাগুলো ভেসে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে পোনাগুলো অপেক্ষকৃত দূর্বল পোনা।



চিত্র-৪.১৩ সুস্থ-সবল পোনা

পোনার আকার ও আকৃতি: মনোসেক্স তেলাপিয়া যেহেতু শুধুমাত্র সর্বভুক প্রকৃতির মাছই নয় উপরন্ত এর রাক্ষুসে স্বভাবের কারণে এরা খাদ্য এবং বাসস্থান নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে বিধায় পোনা ছাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে এরা যেন অবশ্যই একই ওজনের এবং আকার-আকৃতির হয় যাতে সকলেই সমান ভাবে খাদ্য গ্রহন করে একই সাথে সমানভাবে বেড়ে উঠতে পারে।



চিত্র-৪.১৪ এক মাপের সুস্থ-সবল পোনা

পোনা পরিবহন : পোনা প্যাকিং করার সময় সমান আকারের দুটি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে একটি অন্যটির ভিতর ঢুকিয়ে তার ১/৩ অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং ব্যাগের উপরের অংশ এক হাত দিয়ে আটকিয়ে এবং অন্য হাত দিয়ে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে যে কোন ছিদ্র পথে পানি বেরিয়ে যায় কিনা। ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে। পলিথিন ব্যাগের নিছিদ্রতা নিশ্চিত হওয়ার পর উক্ত ব্যাগে পরিমাণ মত পোনা দিয়ে ভাল করে পেচিয়ে সূতালি দিয়ে মজবুত করে বাঁধতে হবে, পরিবহন

২০২৫

কালে পলিথিন ব্যাগ যাতে ছিদ্র হতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় সেই জন্য পলিথিন ব্যাগ অক্সিজেন দিয়ে দিয়ে ভর্তি করে বস্তায় ভরে পরিবহন করতে হবে।



চিত্র-৪.১৫ অক্সিজেন ব্যাগে পোনা পরিবহন

নার্সারি পুকুর থেকে মজুদ পুকুরে পোনা পরিবহনের জন্য খুব বেশি সময় লাগেনা বলে নার্সারি পুকুর থেকে পোনা ধরে এলুমিনিয়ামের হাড়িতে বা ড্রামে করে ভ্যান বা পিকআপ এ করে পোনা মজুদ পুকুরে পরিবহন করা হয়। দুরত্ব বেশি হলে সেক্ষেত্রে অক্সিজেন সমৃদ্ধ পলিথিন ব্যাগে করে পোনা নিয়ে যাওয়া হয়।

পোনা অভ্যস্তকরণঃ পোনার প্যাকেট/হাড়ি ৫০ থেকে ৬০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে যাতে প্যাকেট/হাড়ির ভিতরের পানি এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা আস্তে আস্তে সমান হয়।

পোনা অবমুক্তকরণঃ তাপমাত্রার সমতা আসল কিনা দেখার জন্য হাড়ি বা ব্যারেলের ভিতর হাত দিয়ে বা ব্যাগের মুখ খুলে দিয়ে নিজের হাত বা থার্মোমিটার দিয়ে ব্যাগ এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও পোনার হাড়ি/ব্যারেল/পলি ব্যাগের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান দেখতে হবে, তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত হাড়ি/ব্যারেল/পলি ব্যাগের কিছু পানি পুকুরে এবং পুকুরের কিছু পানি হাড়ি/ব্যারেল/পলি ব্যাগের নিতে হবে, উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে হাড়ি/ব্যারেল/পলি ব্যাগের পুকুরের দিকে কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ্য ও সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে।

পোনা শোধণঃ মনোসেক্স তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে পোনা শোধনের বিষয়টা একটু ভিন্ন ভাবে করা হয় এক্ষেত্রে মাছের পোনাকে শোধন না করে সমস্ত পুকুরের পানিকেই শোধন করে ফেলা হয় যাতে মাছের গায়ে ক্ষত থাকলেও কোন ক্ষতি না হয় বা কোন রোগ জীবাণু যাতে আক্রমন করতে না পারে। তেলাপিয়ার নার্সারি পুকুরে পোনা ছাড়ার পরপরই প্রতি শতাংশে ১ কেজি করে লবন ছিটিয়ে দিতে হবে সেই সাথে অন্যান্য জীবাণুনাশক ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ পরবর্তী কাজ সমূহঃ তেলাপিয়া মনোসেক্সের পোনা মজুদ করার পর যে কাজগুলো করতে হবে তা হচ্ছে–

পোনার মৃত্যুহার পর্যবেক্ষণ : পুকুরে পোনা ছাড়ার ৩-৪ ঘন্টা পর পুকুরের চারিদিকে ঘুরে দেখতে হবে কোনো পোনা মরে ভেসে উঠল কিনা, যে কয়টি পোনা মারা যাবে সেই কয়টি পোনা পুনরায় পুকুরে মজুদ করতে হবে। এখানে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে নজর রাখা অবশ্যক তাহলো মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা যেহেতু

১০২৬

পুকুরের উপরে ভেসে বেড়ায় সেই ক্ষেত্রে শিকারি পাখি বিশেষ করে বক, মাছরাঙা ইত্যাদি জাতীয় পাখি প্রতি নিয়ত এই পোনা ধরে খেতে থাকে বলে পুকুরের উপরি ভাগেও জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া জরুরী।



চিত্র-৪.১৬ মাছখেকো পাখি ও পুকুরে জাল দিয়ে ঘেরা দেওয়া

সম্পুরক খাদ্য প্রদান: মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থ্য ভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রদান খুবই জরুরি বিশেষ করে মনোসেক্স তেলাপিয়ার মত ব্যবসা সফল মাছের জন্য নিয়মিত পরিমিত সুষম খাদ্য প্রদান অত্যন্ত জরুরী। নিয়মিত সুষম খাদ্য প্রদানের উপর মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের উৎপাদন তথা তাদের দেহের পুষ্টিসাধন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সর্বোপরি মাছ চাষের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

মনোসেক্স তেলাপিয়ার সুষম সম্পুরক খাদ্য: পোনা মজুদের দিন থেকেই মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছকে পরিমিত পরিমাণে সুষম সম্পূরক খাদ্য নিয়মিত প্রদান করতে হয়। এরা মাংসাশী প্রকৃতির সর্বভূক বলে এদের খাদ্যে ২৮-৩০% প্রোটিন থাকা একান্ত আবশ্যক সেই সাথে পরিমিত পরিমাণে তেল, ভিটামিন এবং মিনারেলস মিশিয়ে সুষম সম্পুরক খাদ্য তৈরি করতে হয় বলে মনোসেক্স তেলাপিয়ার জন্য বাজার থেকে কেনা প্রতিষ্ঠিত খাদ্য উৎপাদন কোম্পানির ব্রান্ডের খাবারের উপরই নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে হাতে তৈরি খাবারের থেকে মেশিনে তৈরি পিলেট বা ভাসমান খাবারই উত্তম।

হাতে তৈরি ভেজা খাবার একদিকে যেমন অধিক পরিমানে পানিতে মিশ্রিত হয়ে পানির গুণাগুন নষ্ট করতে পারে অন্যদিকে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের বয়সের বিভিন্ন স্তরে এদের শরীরে প্রোটিন গ্রহণের মাত্রারও ভিন্নতা থাকায় চাষীরা বাজারের রেডি ফিস ফিড খাইয়ে চাষ করতেই বেশি পছন্দ করে। সে ক্ষেত্রে ভাসমান খাদ্যের উপরই ইদানিং চাষীরা বেশি নির্ভরশীল। ডুবন্ত পিলেট খাবার পানিতে কাদার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কারণে বেশি অপচয়ই শুধু হয় না পুকুরের পানির গুণাগুন নষ্ট হয়ে যায় বলে মাছের বৃদ্ধি তথা উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে তাই ভাসমান খাবারই অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।



চিত্র-৪.১৭ বিভিন্ন গ্রেডের মাছের খাবার

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ বাজার থেকে কেনা উন্নত মানের ভাসমান সুষম সম্পুরক খাদ্য মনোসেক্স তেলাপিয়া পুকুরে প্রয়োগ করা খুবই সহজ। পুকুরের আয়তন বুঝে এক বা একাধিক মাচা বা পাটাতন তৈরি করে প্রতিদিন একই সময়ে পাটাতন থেকে খাদ্য প্রদান করলে মাছগুলো অভ্যস্থ হয়ে যায় এবং খাবার সময় হলেই তারা আশপাশে ঘুরাঘুরি করতে শুরু করে। ভাসমান খাদ্য যেহেতু পুকুরের উপর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাসতে থাকে সেইজন্য মাছের খদ্যের পরিমাণ বেশি হলে বা মাছ খাদ্য খেতে না চাইলে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এইজন্য ভাসমান খাবারের ক্ষেত্রে খাদ্যের অপচয় খুবই কম হয় তবে খাবারের প্রোটিনের শতকরা হার পরীক্ষা করে নেওয়া উত্তম।



চিত্র-৪.১৮ তেলাপিয়া মাছকে খাদ্য প্রদান

খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ: মজুদকৃত মাছের জন্য কতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তা জানার জন্য অবশ্যই পুকুরের মজুদকৃত মাছের মোট জীবভর বের করতে হবে। জীবভর বলতে ইকোসিস্টেমের একটি নির্দিষ্ট এলাকায়, নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক জায়গায় যে পরিমাণ জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে বুঝায়। যেমন-কোন একটি পুকুরে যে পরিমাণ মাছ ও অন্যান্য জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে ঐ পুকুরের জীবভর বলে। জীবভর বের করার জন্য প্রথমেই মজুদকৃত মাছের গড় ওজন বের করে সেই গড় ওজনকে মজুদকৃত মাছের

২০২৫

মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে মোট জীবভর (Biomass) পাওয়া যাবে। সেই মোট জীবভরকে শতকরা হার (%) দিয়ে গুণ করলে প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যাবে। মনোসেক্স তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে পোনা মজুদের পর থেকে বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে দেহ ওজনের বিভিন্ন শতকরা (%) হারে, ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন মাত্রার খাদ্য প্রদান করতে হয় যা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো-

পালন কাল	পোনার ওজন	খাদ্যের ধরণ	দৈনিক প্রয়োগ মাত্রা (দেহ ওজনের শতকরা হার)	দৈনিক কত বার প্রয়োগ করা হয়
১-১৫ দিন	৫-১৫ গ্রাম	স্টাটার (১-২ মি.মি.আকারের)	২০-১৫%	৩ বার
১৬-৩০ দিন	১৫-৪০ গ্রাম	স্টাটার (২-৩ মি.মি.আকারের)	১০-০৮ %	৩ বার
৩১-৬০ দিন	৪০-১০০ গ্রাম	গ্রোয়ার	০৭-০৫ %	২ বার
৬১-১০০ দিন	১০০ গ্রাম	ফিনিসার	০৩-০২ %	২ বার

৪. দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং খাদ্যের সমন্বয় সাধন : পোনা মজুদের পর অবশ্যই পোনার দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ কাজে নমুনায়নের জন্য ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। ঝাঁকি জালের মাধ্যমে ৭ দিন অন্তর অন্তর বিভিন্ন আকারের ১৫-২০টি মাছের গড় ওজন নিতে হবে। এই গড় ওজনকে মাছের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট ওজন তথা জীবভর পাওয়া যাবে। জীবভর প্রত্যেক দিন পরিবর্তনশীল কারণ প্রত্যেকটি মাছ প্রতিদিন কিছু না কিছু বাড়ে। তাই প্রত্যেকদিনের বর্ধিত জীবভরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবেই মাছচাষে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করে তথা পুকুরের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাবলী মাছচাষের অনুকূলে রেখে কমপক্ষে ৩০ ভাগ প্রোটিন, ৩০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট এবং ১০ ভাগ লিপিড সমৃদ্ধ খাদ্য প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ২ বার নির্দিষ্ট সময়ে মাছের চাহিদা অনুযায়ী (দৈহিক ওজনের ৪-৬ ভাগ) প্রয়োগ করলে প্রত্যেকটি মাছ দৈনিক গড়ে ২ গ্রাম করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।



চিত্র-৪.১৯ মাছের নমুনায়ন

খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ : খাদ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই মাছের গড় ওজন এবং মোট সংখ্যা জানতে হবে। মজুদকৃত তেলাপিয়ার গড় ওজন ৫ গ্রাম, মোট মাছের সংখ্যা ৫০০০ হলে পুকুরে মোট জীবভর হবে ৫০০০x৫ = ২৫০০০ গ্রাম = ২৫ কেজি। মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের ৫ ভাগ হারে খাদ্য প্রয়োগ করলে মোট খাদ্যের প্রয়োজন হবে = ১.২৫ কেজি ।

পানি পরিবর্তন: মাছের গড় ওজন যখন ১০০ গ্রামের বেশি হয় তখন থেকেই দৈনিক ৫-১০% হারে পুকুরের পানি পরিবর্তন করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মজুদের ১০০-১২০ দিন পর থেকে মাছের গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম হয়ে যায়। তখন থেকেই মাছ বিক্রি করা যেতে পারে। যখন মাছের গড় ওজন ৩০০-৫০০ গ্রাম হয় তখন বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সব মাছ ধরে ফেলতে হয়।

মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণ: সাধারণত প্রতিটি তেলাপিয়া মাছের গড় ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম হলে এগুলো বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে তেলাপিয়া বেশ বড় করে (৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি) বিক্রয় করা হয়। সারা বছরই এ মাছের দাম কম বেশি প্রায় একই রকম থাকে। পাইকারি বাজার বা আড়তে মাছের দাম: এর ওজন, বাহ্যিক সৌন্দর্য, যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে কেজি প্রতি ১৫০-২০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ১ কেজির কাছাকাছি বা সমওজনের মাছের দাম কিছুটা বেশি পাওয়া যায়। তেলাপিয়া মাছ ২৫০-৩০০ গ্রাম হতে ১২০ দিন বা ৪ মাস লাগলেও ১ কেজি হতে প্রায় ৮-৯ মাস লেগে যায়। তেলাপিয়ার গড় ওজন ২৫০-৩০০ গ্রামের যত উপরে উঠতে থাকে, খাদ্যের এফ.সি.আর ও উৎপাদন খরচ তত বাড়তে থাকে। তাই তেলাপিয়া সাধারণত ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজন হলেই বিক্রি করা উচিৎ। বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে যেহেতু চাষের পুকুর সাধারণত লিজ বা হারি নেয়া হয়, সেহেতু এই পুকুর গুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে না। তাই তেলাপিয়ার বানিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে বছরে অন্তত দু'বার চাষ করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।



চিত্র-৪.২০ মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

মাছ আহরণের ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতাসমূহ: তেলাপিয়া মনোসেক্স মাছের বাণিজ্যিক চাষে, মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ মাছ আহরণ বা ধরার সময় ও পদ্ধতি যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে খামারিরা বিক্রয় উপযোগী মাছের সঠিক মূল্য পাবে না ফলে তাদের ব্যবসায় লোকসান হবে। ব্যবসায় লোকসান হলে অধিকাংশ প্রান্তিক মাছ চাষিই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই কারণে মাছ আহরণ বা ধরার ক্ষেত্রে নিচের সতর্কতা গুলো অবলম্বন করা উচিত

- বাজারের মাছের চাহিদা ও সরবরাহ খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তবেই আহরণ করা উচিৎ
- সঠিক মাপের ও ফাঁসের লম্বা জাল ব্যবহার করা উচিৎ
- রাতের বেলায় অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যার কারণে মাছ ধরা উচিৎ নয়
- সাধারণত ভোর বেলা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত মাছ ধরার উপযুক্ত সময়
- মাছ ধরার অন্তত ১২ ঘন্টা আগে থেকেই মাছকে খাদ্য দেয়া বন্ধ করতে হবে
- মাছ ধরার আগের রাতেই অথবা ১-২ ঘন্টা আগে অক্সিজেন পাউডার/ট্যাবলেট দিতে হবে
- মাছ ধরে সাথে সাথেই বিক্রির জন্য পরিবহন করা যাবে না
- মাছ ধরার পর এগুলোকে হাপার মধ্যে রেখে পরদিন খুব ভোরে বাজারে নিয়ে যেতে হবে
- হাপাতে মাছ রাখার সময় অবশ্যই অক্সিজেন পাউডার/ট্যাবলেট দিতে হবে
- মাছ ধরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো কোনভাবেই আহত না হয়
- পানি ভর্তি প্লাস্টিকের ড্রামে অক্সিজেন যোগে মাছ পরিবহন করা হয়

আয়-ব্যয়ের হিসাব : মাছ চাষের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখাটা খুবই জরুরি কারণ সঠিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপরই মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে। নিচে এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরের মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলো-

১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ৬ মাসের আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রম	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	পুকুরের খাজনা/ ইজারা মূল্য	গুচ্ছ	-	১০০০০.০
০২	পুকুর প্রস্তুত (সংস্কার সহ)	গুচ্ছ	-	২০০০.০
০৩	বিষ প্রয়োগ (রোটেনন)	৪ কেজি	৩০০.০	১২০০.০
০৪	চুন	৩৩ কেজি	২০.০	৬৬০.০
০৫	গোবর/মুরগির বিষ্টা	২০০০ কেজি	২.০	৪০০০.০
০৬	ইউরিয়া	১০০ কেজি	৩৫.০	৩৫০০.০
০৭	টিএসপি	৫০ কেজি	৩৫.০	১৭৫০.০
০৮	পোনা	৮২৫০ টি	২.০	১৬৫০০.০
০৯	সম্পূরক খাদ্য	২৮৯৫ কেজি	৬৫.০	১৮৮১৭৫.০
১০	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	৫০০০.০	৫০০০.০
১১	বিবিধ	গুচ্ছ	২০০০.০	২০০০.০
			মোট	২৩৪৭৮৫.০

সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুসরণ করলে করলে নিম্নোক্ত উৎপাদন আশা করা যেতে পারে।

১ ফসলে মাছের উৎপাদন = ২২২৭ কেজি

(পোনা ছাড়া হয়েছে : ২৫০/ শতক ,

পোনা বেঁচে থাকার হার: ৯০% অর্থাৎ মোট মাছের সংখ্যা : ৭৪৫০টি

প্রতিটি মাছের ওজন ৩০০ গ্রাম ধরলে মোট ওজন : ২২২৭ কেজি)

বিক্রয় মূল্য = ২২২৭ X২০০ = ৪৪৫৪০০/-

উৎপাদন খরচ = ২৩৪৭৮৫/-

নিট মুনাফা = (৪৪৫৪০০/) – (৪৪৫৪০০/) = ২১০৬১৫/-

২ ফসলে (বছরে) নিট মুনাফা =২১০৬১৫/-X ২ = ৪২১২৩০/-

ভাসমান খাবারের এফ সি আর ১.৩ হলে খাবার লাগে= ২৮৯৫ কেজি

মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের ঝুঁকি :

মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষেও অনান্য মাছ চাষের ন্যয় কিছু ঝুঁকি থাকে, যে সমস্ত সমস্যা গুলো খুব সাবধাণতার সাথে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের মোকাবেলা করতে হয়, যে সমস্ত সমস্যগুলোই বেশি সতর্ক থাকতে হয় তা হলো-

১. পুকুরের পানিতে লালচে/সবুজ স্তর :

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে পুকুরের পানির উপর কয়েক ধরণের স্তর সৃষ্টি হয়, এই স্তর সৃষ্টি হলে পুকুরে মাছের উৎপাদন ব্যহত হয়। সাধারনত: তিন ধরনের সর/স্তর দেখা যায়:

ক) ফাইটোপ্ল্যাংকটন প্রাচুর্যজনিত স্তর: সব সময়ই এটার রং সবুজ থাকে, মোটা কাঁথার মতও দেখা যায়।



চিত্র-৪.২১ পুকুরের পানিতে সবুজ স্তর

কারণ:

সাধারণত এটি অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগের কারণে হয়ে থাকে। খাদ্যে অতিরিক্ত আমিষ, ফসফরাস থাকলেও হতে পারে। অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে

অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায়। অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে ভোর রাতে মাছ পানির ওপর ভেসে উঠে এবং বেশি সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার:

- মাছ খাবি খেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- প্রতি শতকে ৫-৮ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার প্রয়োগ করতে হবে
- সেই সাথে পুকুরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে
- চারা পোনা আকৃতির বা এর থেকে বড় আকৃতির কিছু সিলভার কার্পের পোনা (প্রতি শতকে ১টি) ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
- সম্ভব হলে ঘাসের দড়ি দিয়ে চাপিয়ে নিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে

অথবা

- সবুজ স্তরের জন্য প্রতি শতকে ১৫ গ্রাম (৩-৫ ফুট গভীরতায়) তুঁতে পাতলা কাপড়ে ছোট ছোট পুটলায় বেধে পানি পৃষ্ঠের ১/২ ফুট নিচে খুটির মাধ্যমে বেধে দিতে হবে
- তুঁতে প্রয়োগের ৩য় দিন পুকুরে ২০ কেজি/একর হারে জিওলাইট ও গ্যাস এবজরবেন্ট ২০০ গ্রাম/একর হারে প্রয়োগ করতে হবে। অথবা জিওলাইট ও গ্যাস এবজরবেন্ট না পাওয়া গেলে প্রতি শতকে ৩০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে

খ) ইউগ্লেনাজনিত স্তর: এই ধরনের সর দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে লালচে-বাদামী বর্ণ ধারণ করে কিন্তু পড়ন্ত বিকেলে বা সন্ধ্যায় আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই সবুজ বর্ণ ধারন করে; এটার মধ্যে হাত কিংবা কোন কাঠ ঢুকিয়ে দিলে সরে যায় আবার হাত বা কাঠ বের করে নিলে সাথে সাথেই বুজে যায়।



চিত্র-৪.২২ পুকুরের পানিতে ইউগ্লেনা স্তর

প্রতিকার:

- ইউগ্লেনা হলে স্তরটি একপাশে চাপিয়ে বা বাতাসে এক পাশে চলে আসলে ৩ দিন অন্তর-অন্তর তুলে ফেলতে হবে এইভাবে ৩-৪ বার প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করতে হবে

  অথবা

- জমে থাকা ইউগ্লেনার স্তরের উপর প্রতি শতকের জন্য ১ কেজি হারে টাটকা দলা অবস্থায় থাকাতেই পুকুর পাড়ে নিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে পাথুরে চুনে (প্রতি কেজিতে ২০০ মিলি) পানি ছিটিয়ে দিয়ে পাউডার বানিয়ে ঠান্ডা হলেই সতর্কতার সাথে ইউগ্লেনার স্তরের উপর ছিটিয়ে দিন

সর্তকতা:

- চুন প্রয়োগের সময় হাতে গ্লোভস, চোখ, মুখ ও দেহ সুরক্ষিত করে নিতে হবে।

গ) আয়রন জনিত স্তর:

এটি সব সময়ই লালচে বাদামী: এটির বর্ণ কখনই পাল্টায় না



চিত্র-৪.২৩ পুকুরের পানিতে আয়রণ স্তর

কারণ:

পানিতে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকা বা আয়রন সম্বলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ

প্রতিকার:

- বোরিং এর গভীরতা আয়রন মুক্ত স্তরে স্থাপন করতে হবে
- সম্ভব না হলে ঘাস সম্বলিত নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত করে একটি পুকুরে ফেলে তারপর মূল পুকুরে সরবরাহ করতে হবে
- সম্ভব না হলে বাঁশ বা ঘাসের দড়ি দিয়ে চাপিয়ে নিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে
- পুকুরে প্রতি শতকে ২০০ গ্রাম চুন এবং ৫০-১০০ গ্রাম/শতক হারে ফিটকিরি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. খাবি খাওয়া বা অক্সিজেনের অভাব জনতি ঝুঁকি মোকাবেলা

পুকুরে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। সকালের দিকে বা দিনের অন্যান্য সময় মাছ যদি পানির উপর ভেসে খাবি খায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে। মেঘলা দিনে অথবা কোন কোন সময় বৃষ্টির পরও অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান ৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর নীচে নেমে গেলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

লক্ষণ:

- মাছ পানির উপর ভেসে খাবি খায়
- মাছ ক্লান্তভাবে পানির উপরিভাগে ঘোরাফেরা করে
- শামুক ও ঝিনুক পুকুরের কিনারে এসে জমা হয়
- অক্সিজেনের খুব বেশী অভাব হলে মাছ মরতে শুরু করে এবং মৃত মাছের মুখ খোলা থাকে ও ফুলকা কেটে যায়।

প্রতিকার:

- পানিতে সাঁতার কাটা
- বাঁশ দ্বারা পানির উপর পেটানো
- হররা টেনে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ানো
- পুকুরে পাম্প বসিয়ে পুকুরের পানি সঞ্চালন করে ঢেউয়ের সৃষ্ঠি করা
- বাহির থেকে নতুন পানি সরবরাহ করা
- সম্পুরক খাদ্য ও সার ব্যবহার কমিয়ে বা বন্ধ করে দেয়া
- শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে চুন দেয়া

৩. এ্যামোনিয়াজনিত ঝুঁকি মোকাবলো

পানিতে এ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে পানির রং তামাটে বা কালচে রংয়ের হয়, মাছ মরতে শুরু করে। পুকুরের পানিতে এ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর উর্ধ্বে উঠলে এ সমস্যা হতে পারে।

লক্ষন:

- মাছের ছুটাছুটি বেড়ে যায়
- মাঝে মাঝে লাফিয়ে পানির উপর উঠে আসে

প্রতিকার:

- মাছের মজুদ ঘনত্ব কমাতে হবে
- সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে
- পুকুরের পানি কমিয়ে নতুন করে পানি সরবরাহ করতে হবে

৪. কার্বন-ডাই-অক্সাইড জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা

পুকুরে কোন কারণে মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গেলে মাছের দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়। পুকুরের পানিতে মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজনীয় মাত্রা উর্ধ্বে ১২ মিলিগ্রাম/লিটার।

লক্ষণ:

- পানিতে অক্সিজেন কমে যায়
- মাছের শ্বাসকষ্ট হয়

প্রতিকার:

- পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে, হররা টেনে, সাঁতার কেটে, পুকুরে পাম্প বসিয়ে, এরেটর ব্যবহার করে পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্ঠি করা
- পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- সার প্রয়োগ করে উদ্ভিদকণার পরিমান বাড়ানো
- প্রয়োজনে নতুন পানি সরবরাহ করা
- মাছ ছাড়ার পূর্বে পুকুর তৈরির সময় অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলা

৫. পি.এইচ জনিত সমস্যা:

পুকুরের পানির পি.এইচ এর তারতম্য ঘটলে মাছের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। পুকুরের পানিতে পি.এইচ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৭-৯।

লক্ষন :

- পানিতে পি.এইচ কম থাকলে মাছের শরীর থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা বেরিয়ে যায়
- ফুলকা আক্রান্ত হয়
- পি.এইচ বেশী হলে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায়
- মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায়
- মাছের শরীর খসখসে হয়ে যায়, মাছ ক্রমে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়

প্রতিকার:

- পি.এইচ কম হলে সাধারনতঃ শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে চুন ব্যবহার করতে হবে
- ডলোমাইট অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে পিএইচ মান বাড়ানো যায়
- পি.এইচ এর মাত্রা বেড়ে গেলে পুকুরে তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ৩-৪ দিন ভিজিয়ে তা তুলে ফেলতে হবে
- তেঁতুল পানিতে গুলে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়

৬. তলদেশে বিষাক্ত গ্যাস জনিত ঝুঁকি

২০২৫ বাণিজ্যিক মাছ চাষে, মাছকে সাধারণত পিলেট ফিড (ডুবন্ত/ভাসমান) খাওয়ানো হয়। এই খাদ্যের কিছুটা অপচয় হয় (ডুবন্ত ফিডের ক্ষেত্রে যা ১০-১৫% ও ভাসমান ফিডের ক্ষেত্রে <৫% ধরা হয়) যা পুকুরের

তলদেশে জমে এবং বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা পঁচে ক্ষতিকর এমোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন করে যা জলজ মাছের জীবন ধারণের জন্য অনুপোযোগী করে তোলে। ফলস্বরূপ হঠাৎ করেই ব্যাপকভাবে মাছ মারা যায়।

লক্ষণ :

- পানির সবুজ/সবুজাভ বাদামী বর্ণ পরিবর্তন হয়ে খড়ের বর্ণ অথবা গাঢ় খয়েরী বর্ণ ধারণ করবে
- পুকুরে তলদেশ থেকে বুঁদ বুঁদ আকারে মাঝে মাঝেই গ্যাস ওঠা
- পুকুরের তলদেশের মাটি থেকে ঈষৎ ঝাঁঝালো গন্ধ বের হবে
- মাছ অস্বাভাবিকভাবে খাবি খেতে পারে/ হঠাৎ মড়ক দেখা দিতে পারে

প্রতিরোধঃ

- প্রতি ১৫/২০ দিন পর পর হররা টানা
- মাছের দৈহিক গড় ওজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় পিলেট ফিড প্রয়োগ করতে হবে
- সপ্তাহে অন্তত একদিন পিলেট ফিড খাওয়ানো বন্ধ রাখা উচিত
- মজুদ ঘনত্ব অবশ্যই আপনার চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে
- যদি সম্ভব হয় তাহলে পুকুরের ৩০-৪০% পানি পরিবর্তন করা যেতে পারে

প্রতিকার :

- Zeolite (Megazeo Plus, ACME Zeolite, Geotox etc) ১৫০-২০০ গ্রাম / শতকে ব্যবহার্য
- Gas Reducer (Ammonil, Gasonil, Gasonex Plus etc) ৪-৫ গ্রাম/শতকে ভেজা বালির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে
- সপ্তাহে অন্তত একদিন পিলেট ফিড খাওয়ানো বন্ধ রাখা উচিত
- মজুদ ঘনত্ব অবশ্যই আপনার চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- যদি সম্ভব হয় তাহলে পুকুরের ৩০-৪০% পানি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৭. বর্ষাকালনি ঝুঁকি মোকাবলোঃ

বর্ষাকালে পুকুরে মাছের চাষ করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সেগুলো নিচে দেওয়া হল-

- বর্ষাকালে পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য পুকুর পাড় অনেক উচু করতে হবে। এমনভাবে পুকুরের পাড় নির্মাণ করতে হবে যাতে কোনভাবেই বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে। আর প্রয়োজন হলে পুকুরের চারদিকে নেট দিয়ে উচু করে বেড়া দিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের মাছ বাইরে যেতে পারবে না
- বর্ষাকালে মাছ চাষের সময়ে বৃষ্টির পানিতে মাছ চাষের পুকুর পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য মাছ চাষের পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে পুকুরে পূর্ণ হয়ে মাছ বের হয়ে যেতে পারবে না
- বর্ষাকালে পানির ধাক্কা বা ভারী বর্ষণের কারণে যাতে পুকুরে পাড় ভেঙ্গে না যায় সেজন্য পুকুরের পাড়ে ঘাস বা ছোট গাছ লাগিয়ে দিতে হবে যেগুলো মাটির ভাঙন রোধ করবে

- বর্ষাকালে পুকুরের পানির রং পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আবার কখনও কখনও পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে যেতে পারে। সেজন্য এই সময়ে পুকুরের পানি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- বর্ষাকালে পুকুরে মাছ চাষ করার সময় পুকুরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা যাবে না। এ সময়ে আকাশ মেঘলা থাকলে বা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মাছের খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে
- বর্ষাকালে মাছের বিভিন্ন জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য কয়েকদিন পর পর পুকুর থেকে মাছ তুলে এনে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে মাছের কোন রোগ হয়েছে কিনা। কোন মাছ রোগে আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. পুকুরে মাছ চাষে শীতকালীন ঝুঁকি মোকাবেলা

শীতের সময়ে মাছের পরিচর্যা করতে যেসব কাজ করতে সেগুলো নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

- শীতের আগেই পুকুরে চাষ করা মাছ যেগুলো বিক্রির উপযোগী হয়েছে সেগুলোকে তুলে বিক্রি করে দিতে হবে। এতে শীতের সময়ে কম সংখ্যক মাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে।
- শীতের সময়ে মাছ চাষে পুকুরের গভীরতা কম থাকলে পানি সরবরাহ করে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে ৪ থেকে ৫ ফুট পানি থাকে। এতে শীতের সময়ে মাছ চাষে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।
- শীতকালে মাছ চাষের পুকুরে সঠিক মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কোনভাবেই অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্য প্রদান করা যাবে না। এতে পুকুরে গ্যাসসহ নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।
- শীতের সময়ে পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পুকুরের আশপাশের বড় কোন গাছ কিংবা আবর্জনা থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- শীতের সময়ে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে। পানির পিএইচ ও অ্যামোনিয়ার মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর দরকার হলে মাঝে মাঝে পুকুরের পানি পরিবর্তন করে ফেলতে হবে।
- মাছের পুকুরে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন, পটাশ ও লবন প্রয়োগ করতে হবে। এতে শীতের সময়ে মাছের রোগ অনেকটাই কমে যাবে।
- রোগবালাই : মাছের রোগবালাই প্রতিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তা হলো ১. পুকুরের পরিবেশ ও পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা, ২. জলজ আগাছামুক্ত রাখা, ৩. পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ার ব্যবস্থা করা, ৪. অনাকাঙ্ক্ষিত জলজপ্রাণী অপসারণ করা, ৫. অতিরিক্ত কাদা সরানো, ৬. দুই-তিন বছর পর পর পুকুর শুকানো, ৭. চুন প্রয়োগ করা, ৮. মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, ৯. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা, ১০. হররা টানা, ১১. পাখি বসতে না দেয়া, ১২. জাল শোধন করে ব্যবহার করা, ১৩. রোগাক্রান্ত মাছ অপসারণ করা, ১৪. সব সময় ঢেউয়ের ব্যবস্থা করা।

অনুসন্ধানমূলক কাজ:

রহিমা বেগম তার পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ করেছেন কিন্তু তিনি পুকুরে মাছের জন্য কি পরিমান খাবার দেবেন বুঝে উঠতে পারছেন না বলে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করতে এলে তোমার শ্রেণি শিক্ষক তোমাকে উনার পুকুর পরিদর্শন শেষে নিম্নের তথ্য গুলো উপস্থাপন করতে বললেন।

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
ঠিকানা	
পুকুরের আয়তন	
মাছ ছাড়ার তারিখ	১. ২. ৩. ৪.
কতটা মাছ ছাড়া হয়েছে?	১. ২. ৩
মাছ ছাড়ার সময় মোট মাছের ওজন কত ছিলো?	
সর্বশেষ কত তারিখে স্যাম্পলিং করা হয়েছে?	
পুকুরে নিয়মিত খাদ্য দেওয়া হয় কিনা?	
মাছকে কোন ধরনের খাবার দেওয়া হচ্ছে ? (ভেজাবল, ডুবন্ত পিলেট, ভাসমান)	
পুকুরের পানির বর্ণ কেমন?	
দিনে কয়বার খাবার দেওয়া হয় ?	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে লেখ।

ক্রমিকনং	কাজের নাম

জব ১: মনোসেক্স তেলাপিয়ার পুরুষ ও স্ত্রী পোনা শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য পুকুরের পানির কিনারায় অথবা ল্যাবরেটরিতে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।
- মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনা সংগ্রহ করা ।
- খুব সাবধানতার সাথে সঠিক ভাবে পুরুষ ও স্ত্রী পোনা চিহ্নিত করা।
- পুরুষ পোনা গুলোকে চাষের জন্য পৃথক করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগল্স	কাঁচ/প্লাস্টিক	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	৫ ফুট লম্বা	১টি
০৬	সাবান	উচ্চ মানের	১টি
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১০০ এম.এল	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এল্যুমিনিয়ামের হাড়ি		২ টি
০২	বালতি	প্লাষ্টিকের, ১৫ লি.	২ টি
০৩	আঁতশ কাচ	৫ সেমি ব্যাস	২ টি

(গ) কাজের ধারা:

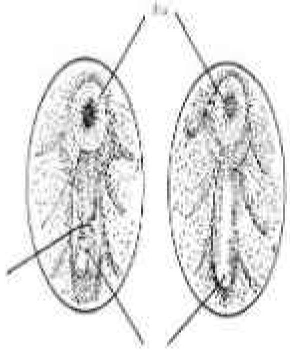
১. পোনা শনাক্তকরণের জন্য তেলাপিয়া পোনা সংগ্রহ কর।

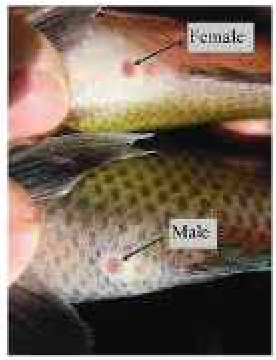
২. নিম্নোক্ত অঙ্গসমূহ বা দেহের বর্ণ পর্যবেক্ষণ করে স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়া শনাক্ত কর।

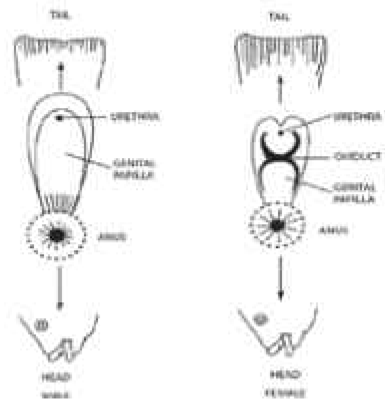
পুরুষ তেলাপিয়া	স্ত্রী তেলাপিয়া
পুরুষ তেলাপিয়ার জননেন্দ্রীয় ২ ছিদ্র বিশিষ্ট, সাদা ও লম্বাটে।	স্ত্রী তেলাপিয়ার জননেন্দ্রীয় ৩ ছিদ্র বিশিষ্ট, খাটো ও লালচে রঙের।
পুরুষ পোনার থুতনি ধুসর/ নীলচে-ধুসর বর্ণের হয়।	স্ত্রী পোনার থুতনি "হলুদ" বর্ণের হয়।

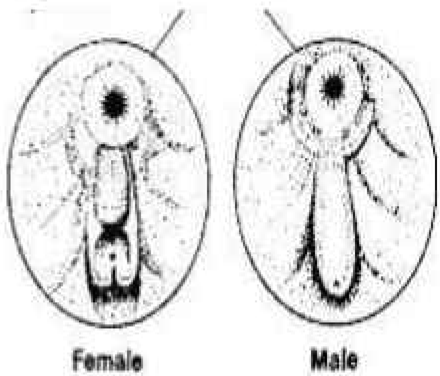
৩. পুরুষ পোনা গুলো পৃথক করে বালতিতে সংগ্রহ কর।

৪. পৃথককৃত পুরুষ পোনা গুলো চাষের জন্য পুকুরে মজুদ কর।









কাজের সাবধানতা:

- পুরুষ ও স্ত্রী তেলাপিয়ার পোনাকে খুব সতর্কতার সাথে পার্থক্য না করলে পুরো মাছ চাষই বিফল হয়ে যাবে।

আত্ম প্রতিফলন :

মনোসেক্স তেলাপিয়ার পুরুষ ও স্ত্রী পোনা সনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: পুকুরের বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ সংগ্রহ করার উপকরণ নির্বাচন করা ।
- বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ সংগ্রহ করা ।
- বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ সনাক্ত করা।
- শনাক্ত করার পর অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ সমূহ সংরক্ষণ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগল্স	কাঁচ/প্লাস্টিক	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	৫ ফুট লম্বা	১টি
০৬	সাবান	উন্নত মানের	১টি
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১০০ এম.এল	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	২০ লিটার	১টি
০২	বালতি	প্লাষ্টিকের, ১৫ লি.	১টি
০৩	ঝাঁকি জাল	মাঝারি	১টি
০৪	স্পেসিমেন জার	কাচের, চায়না	৫টি
০৫	ফরমালিন	মার্ক,	৫ লিটার
০৬	পার্মানেন্ট মার্কার	কালো রঙের,	১টি
০৭	খাতা	সাদা কাগজের,	১টি
০৮	পেন্সিল	২বি	১টি

(গ) কাজের ধারা :

১. প্রতিষ্ঠানের পুকুর হতে/নিকটস্থ কোনো পুকুর হতে বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছ তাজা অবস্থায় সংগ্রহ করি।

২. সংগৃহীত মাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছ সনাক্ত করি ।

৩. প্রতি প্রকারের মাছ পৃথক করে স্পেসিমেন জারে ফরমালিন দ্রবণ দিয়ে সংরক্ষণ করি ।

৫. প্রতিটি স্পেসিমেন জারের উপর পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে লিখে রাখ প্রজাতির নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, সংগ্রহের স্থান ও সংগ্রহের তারিখ।

৪. ব্যবহারিক খাতায় বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছের ছবিসহ গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি ।

কাজের সাবধানতা:

- অবাঞ্ছিত ও মৎস্যভূক মাছ গুলো সনাক্ত করার সময় সঠিক ভাবে শনাক্ত করতে হবে
- মাছ সংরক্ষনের সময় খুব সাবধানতার সাথে করতে হবে যেন ফরমালিনের মাত্রা বেশি হয়ে না যায় তাহলে মাছ বেশি দিন থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে

আত্ম প্রতিফলন:

পুকুরের বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: হররা তৈরি এবং তা টেনে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূরীকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- হররা তৈরির উপাদান নির্বাচন করা।
- হররা তৈরির পোড়া মাটির কাঠি/পুথি সংগ্রহ করা।
- হররা তৈরির পোড়া মাটির কাঠি/পুথি মোটা নাইলনের দড়ির সাথে সঠিক ভাবে বাধা।
- সঠিক ভাবে হররা টানা।
- অতিরিক্ত উপকরণ সঠিক জায়গায় রাখা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	উন্নতমানের সুতি কাপড়ের	১টি
০২	গ্লোভস	রাবারের,	১ জোড়া
০৩	গগল্স	কাচ/প্লাস্টিক	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	উন্নতমানের, ৫ ফুট লম্বা	১টি
০৬	সাবান	উন্নতমানের	১টি
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১০০ এম.এল.	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পোড়া মাটির কাঠি / পুথি	উন্নতমানের, আগুনে পোড়ানো	পুকুরের আয়তনের উপর নির্ভরশীল।
০২	মোটা নাইলনের দড়ি	উন্নতমানের	পুকুরের আয়তনের উপর নির্ভরশীল।
০৩	চিকন নাইলনের দড়ি	উন্নতমানের	পুকুরের আয়তনের উপর নির্ভরশীল।

(গ) কাজের ধারা :

১. পুকুরের প্রস্থ অনুযায়ী লম্বা মোটা রশি নিয়ে এর মধ্যে ৮-১০ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করে পোড়া মাটির কাঠি / পুথি গুলো সুতা দ্বারা বেঁধে দাও।

২. পুকুরের দৈর্ঘ্য বরাবর হড়রাকে দু'পাশ থেকে পাড় বরাবর ধীরে ধীরে টানতে থাক।

৩. এ কার্যক্রমটি একাধিকবার কর।

৪. হররা সাধারণত সকাল বেলায় টানবে।

৫. পুরাতন পুকুরে সপ্তাহে একবার করে হররা টানবে।

৬. হররা টানার পর হররা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে দাও।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি ব্যাবহারিক খাতায় ধারাবহিকভাবে লিখে রাখ।

কাজের সাবধানতা:

- পোড়া মাটির কাঠি / পুথি গুলো যেন সমান দুরত্বে বাধা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে
- হররা টানার সময় তাড়াহুড়া না করে আস্তে আস্তে টানতে হবে
- তবে মনে রাখতে হবে পুকুরে যখন অক্সিজেন স্বল্পতায় মাছ ভেসে উঠে তখন অথবা খুব ভোরে হররা না টানাই ভাল
- সূর্য উঠলে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাছ স্বাভাবিক হলে তখন হররা টানা যেতে পারে।

আত্ম প্রতিফলন :

হররা তৈরি এবং তা টেনে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূরীকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: মাছের নমুনা সংগ্রহ, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও খাদ্যের পরিমান নির্ধারন।

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- ঝাঁকি জাল /বেড় জাল ব্যবহার করে মাছ সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে মাছের গড় ওজন নির্ণয় করে মোট ওজন বের করা।
- খাদ্যের পরিমাণ সঠিকভাবে পূণঃনির্ধারন করা।
- মাছের স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা খেয়াল করা।
- নির্বাচিত মাছকে ঠিকমত পানিতে জিইয়ে রাখা।
- পরিমাপ শেষে সব মাছকে পুনরায় পানিতে ছেড়ে দেওয়া।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	উন্নতমানের সুতি কাপড়ের	১টি
০২	গ্লোভস	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গগল্স	উন্নতমানের কাচ/প্লাস্টিক	১টি
০৪	গামবুট	উন্নতমানের রাবারের	১ জোড়া
০৫	গামছা	উন্নতমানের ৫ ফুট লম্বা	১টি
০৬	সাবান	উন্নতমানের	১টি
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১০০ এম.এল, দেশি	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ঝাঁকি জাল	উন্নতমানের চিকন নাইলন সুতার তৈরি।	১টি
০২	বেড় জাল	উন্নতমানের চিকন নাইলন সুতার তৈরি।	১টি
০৩	ডিজিটাল ব্যালেন্স	১০ কেজি পর্যন্ত মাপা যায় এমন,	১টি
০৪	ক্যালকুলেটর	উন্নতমানের	১টি
০৫	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	৪০ লিটার, দেশি	২টি
০৬	হাপা	উন্নতমানের সুতি কাপড়ের বা গ্লাস নাইলনের	
০৭	খাতা	উন্নতমানের সাদা কাগজের	
০৮	পেন্সিল	২বি, উন্নতমানের	

২০২৫

(গ) কাজের ধারা

১. ঝাঁকি জাল দিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাছ ধরে গুণে গুণে পরিষ্কার পানিতে বড় হাড়ির মধ্যে অথবা হাপায় রাখ (এক্ষেত্রে সম্ভব হলে বেড় জালও ব্যবহার করা যেতে পারে)। বড় মাছ হলে (৩০০ গ্রামের চেয়ে বড়) মোট মজুদ মাছের ৫% আর মাছ ছোট থাকলে ১০% মাছ সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত মাছ আগে থেকেই পানি সহ ওজন করে রাখা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে দিয়ে ডিজিটাল ব্যালেন্সের সাহায্যে ওজন কর। এবারে মোট মাছের ওজনকে মাছের সংখ্যা দিয়ে ভাগ কর। ধর পুকুরে ৭৫০টি পোনা মজুদ করা হয়েছিল। নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে ৭৬টি মাছ। ওজন করে দেখা গেল মোট ১১ কেজি ৪০০ গ্রাম অতএব ১১.৪০০/৭৬ = ০.১৫ কেজি বা ১৫০ গ্রাম গড় ওজন

৩. ৮০% বেঁচে থাকার হার ধরে পুকুরে এ সময়ের অনুমানকৃত মাছের মোট ওজন হবে

$$\frac{৭৫০\times৮০}{১০০} = ৬০০\text{টি মাছ}$$

$$৬০০\times০.১৫ = ৯০ \text{ কেজি মাছ আছে।}$$

৪. খাতা /পুকুরের রেকর্ড বইতে তারিখসহ নমুনা সংগ্রহের তথ্য বিস্তারিত লিখে রাখ

৫. মোট মাছের ওজন থেকে পুকুরের মাছের খাদ্য প্রদানের পরিমান পূনঃনির্ধারণ কর।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যাবহারিক খাতায় লেখ।

কাজের সাবধানতা:

- সব প্রজাতির ও ছোট- বড় সব ধরেন মাছের গড় ওজন যেন নেয়া হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। তা না হলে মোট খাদ্যের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারিত হবে না বিধায় মাছের উৎপাদন ঠিক কমে যাবে এবং পুকুরের পানির গুণাগুন নষ্ট হয়ে যাবে, যা মাছ চাষের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

আত্ম প্রতিফলন :

মাছের নমুনা সংগ্রহ, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুশীলন।

পারদর্শিতার মানদন্ড :

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা
- উপকরণ নির্বাচন করে কাজের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা
- প্রত্যেকটা খরচের হিসাব ও আয়ের হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে রাখা
- প্রতিটি ক্রয় ও বিক্রয়ের ভাউচার যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা
- পরিবারের খাওয়ার ও অন্যান্যকে প্রদান করা মাছর হিসাব রাখা
- উপকরণ ও মালামালের বেঁচে যাওয়া অংশের দাম নির্ধারন করে হিসাবে আনা
- নিয়মিত ভাবে প্রতি দিনের হিসাব প্রতিদিন করা
- কাজ শেষে উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে রাখা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	উন্নতমানের সুতি কাপড়ের	১টি
০২	সাবান	উন্নতমানের	১টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১০০ এম.এল, দেশি	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্টস, মেশিন):

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ঝাঁকি জাল	উন্নতমানের চিকন নাইলন সুতার তৈরি।	১টি
০২	বেড় জাল	উন্নতমানের চিকন নাইলন সুতার তৈরি।	১টি
০৩	ডিজিটাল ব্যালেন্স	১০ কেজি পর্যন্ত মাপা যায় এমন, চায়না	১টি
০৪	ক্যালকুলেটর	উন্নতমানের	১টি
০৫	এলুমিনিয়ামের হাড়ি	৪০ লিটার, উন্নতমানের	১টি
০৬	হাপা	সুতি কাপড়ের বা গ্লাস নাইলনের, উন্নতমানের	
০৭	খাতা	সাদা কাগজের, দেশি	১টি
০৮	পেন্সিল	২বি	১টি
০৯	লাল কলম	বল পয়েন্ট, উন্নতমানের	১টি
১০	কাল কলম	বল পয়েন্ট, উন্নতমানের	১টি

(গ) কাজের ধারা

১. পুকুর প্রস্তুতির প্রথম থেকেই নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক খরচের হিসাব রেকর্ড বইয়ে লিখে রাখ।

তারিখ	উপকরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা	মন্তব্য
			সর্বমোট		

২. এবার পুকুরের বিভিন্ন উৎস থেকে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক আয়ের হিসাব রাখ।

তারিখ	উপকরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা	মন্তব্য
			সর্বমোট		

৩. এবার আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করে লভ্যাংশ বের করতে হবে ।

৪. ক্ষতি হলে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

কাজের সাবধানতা:

- প্রতি দিনের হিসাব প্রতিদিন ভাউচারের সাথে মিলিয়ে লেখে রাখি।
- নিজের খাওয়ার ও অন্যকে প্রদান কৃত মাছের দাম হিসাব করে খাতায় আয় হিসাবে লেখে রাখি।

আত্মপ্রতিফলন

মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-৪

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. GIFT এর পূর্ণরূপ কী?

২. তেলাপিয়া মাছ চাষের বড় সমস্যা কী?

৩. নার্সারি পুকুরে প্রতি শতাংশে কয়টি পোনা মজুদ করা হয়?

৪. মজুদ পুকুরে কতো গ্রাম ওজনের পোনা মজুদ করা হয়?

৫. মজুদ পুকুরে প্রতি শতাংশে কয়টি পোনা মজুদ করা হয়?

৬. মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি পুকুর কতো শতাংশ হলে ভাল হয়?

৭. নার্সারি পুকুর কি দিয়ে ঘেরা হয়?

৮. মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছকে শতকরা কতো ভাগ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়?

৯. মনোসেক্স তেলাপিয়া ১০০ গ্রাম হলে প্রতিদিন পুকুরের কতো শতাংশ পানি পরিবর্তন করতে হয়?

১০. জীবভর বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নার্সারি পুকুরে কী কী সার দেওয়া হয় নাম লেখ।

২. পানির বিষাক্ততা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?

৩. নার্সারি পুকুরের পোকা মাকড় কিভাবে দমন করা হয়?

৪. হররা কেনো টানা হয় পুকুরে?

৫. পুকুর পাড়ে গাছপালা থাকলে কী ক্ষতি হয়?

৬. মনোসেক্স তেলাপিয়ার ভাল পোনার ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৭. মনোসেক্স তেলাপিয়া কত বড় হলে পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয়?

৮. মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের ২টি গুরুত্ব লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মনোসেক্স তেলাপিয়ার নার্সারি ব্যবস্থাপনা লেখ।

২. মাছের নমুনা সংগ্রহ, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ কিভাবে করা হয় বর্ণনা করো।

৩. মাছ আহরণ ও বাজারজাত করনে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়?

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।